ISSN 2278-8026

অরুণ

নবপর্যায় ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥ ২০১৬

বিভাগীয় পত্রিকা

বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ

অরুণ

নবপর্যায় ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥ ২০১৬

সম্পাদনা সমিতি

মিতা চক্রবর্তী
শিপ্রা গুহ নিয়োগী
প্রশান্ত চক্রবর্তী
দেবযানী দে
প্রসূন বর্মন
বরুণ কুমার সাহা

এই সংখ্যার সম্পাদক
মধুপী পুরকায়স্থ

বঙ্গ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ
বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ

অরুণ

প্রকাশক
বঙ্গ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ
বাংলা বিভাগ ॥ কটন কলেজ ॥ গুয়াহাটির পক্ষে মিতা চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৬

এই সংখ্যার সম্পাদক
মধুপী পুরকায়স্থ

নামলিপি
প্রদ্যোত চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
নয়নজ্যোতি শর্মা

দাম
১০০ টাকা

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
ভিকি পাবলিশার্স
সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, চিলারায় রায় পথ, ভাঙাগড়
গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৫

ISSN 2278-8026

উৎসর্গ

অমলেন্দু গুহ
(১৯২৪-২০১৫)
ও
রুচিরা শ্যাম
(১৯৪৫-২০১৫)

কৃতজ্ঞতা
উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত চক্রবর্তী, সৌমেন ভারতীয়া,
তাপস পাল, বাসব রায়, নয়নজ্যোতি শর্মা

নিবেদন

কটন কলেজ বাংলা বিভাগের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিভাগীয় পত্রিকা 'অরুণ'-এর সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হল।

১৯০৭ সালে যে শিশুসূর্যের জন্ম হয়েছিল আজ সে পূর্ণবয়স্ক, দীর্ঘ সময়ের যাত্রাপথে অনেক বাধাবিঘ্ন এসেছে, কিন্তু 'অরুণ' আজও তার দীপ্তিতে ভাস্বর।

'অরুণ'-এর এই সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। কয়েকজন নবাগত লেখকের লেখাও থাকছে। বিষয়বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠকদের ভালো লাগলে আমরা সমৃদ্ধ হব।

সূচিপত্র

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' দেশভাগ ও প্রব্রজনের ভিন্ন আখ্যান	তপোধীর ভট্টাচার্য	৯
ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণ	মিতা চক্রবর্তী	২৩
'টপ্পা ঠুংরি'র বিষ্ণু দে	শিপ্রা গুহ নিয়োগী	৩৪
বঙ্গে নারীভাবনা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সমকাল	মধুপী পুরকায়স্থ	৩৮
রাভা সাহিত্য ও চাম্পাই	দেবযানী দে	৪৮
ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের দলিত সাহিত্য : কিছু কথা	অনামিকা চক্রবর্তী	৫২
অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা, নারীর Identity Crisis এবং বনফুলের ছোটগল্প : একটি অনুসন্ধান	জাহ্নবী দাশ	৬০
দাম্পত্য সমীকরণ : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি উপন্যাস	সোমা চক্রবর্তী	৬৭
বনফুলের সাহিত্য ভুবনে কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	বরুণ কুমার সাহা	৭০
দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প: নির্বাচিত পাঠ	মৌমিতা পাল	৭৬
মেয়েদের রচিত বাংলা ছোটগল্পে মেয়েদের অস্তিত্বের সংকট	তপতী দত্ত	৮৪
বীরচন্দ্র দেববর্মা : ইতিহাসে উপেক্ষিত এক কবি	প্রসূন বর্মন	১০৫
লেখক-পরিচিতি		১২০

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' দেশভাগ ও প্রব্রজনের ভিন্ন আখ্যান

তপোধীর ভট্টাচার্য

> 'Fiction has multiple and heterogeneous causes; it serves multiple and heterogeneous purposes. Among other things, it can be a means of intellectually and emotionally deferring the writer's encounter with his or her own finitude. Neither the causes nor the functions of fiction, though, reveal its being as clearly as the opposite, the fundamental alter, against which it stands... The presence of fiction... fills, or leeks to fill, a horrible expressive vacuum.' [Paul Raolinow, preface in Aesthetics, Method and Epistemology essential works of Michel Foucault, volume II, Penguin, London, 1998, Part xiv]

বাস্তব ও কল্পনার দ্বিবাচনিকতা যে কত অনেকান্তিক, তা সাম্প্রতিক আখ্যানবিশ্বে বিচিত্রভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। ভুবনায়নের পর্যায়ে আখ্যানের সৃজনী ভাবনাও আন্তর্জাতিক। সৃষ্টিশীল লেখকের সামনে এখন অভাবনীয় প্রত্যাহ্বান : একদিকে আখ্যানবিশ্বের নতুন নতুন আলো-হাওয়ার অভিভব এবং অন্যদিকে মননের স্বরাজকে মান্যতা দিয়ে শিকড়ে জলের ঘ্রাণ অটুট রাখা। লেখক ভালোই জানেন, তাঁর নিজস্ব উৎস-জাত সামাজিকতা ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান সামর্থ্যের সীমারেখাও স্পষ্ট করে দেয়। বৌদ্ধিক ও অনুভবগত মোকাবিলা করতে করতেই তাঁকে তবু এগিয়ে যেতে হয় শিল্প স্বভাবের পুনরাবিষ্কারে। প্রচলিত উপন্যাসের পাঁজর থেকে আখ্যানের নতুন নতুন ঘরানা তবু যে উদ্ভূত হচ্ছে, এর কারণ নিহিত রয়েছে ওই সীমারেখার সঙ্গে লেখকের নিয়ত নবায়মান সংঘর্ষে। ঘরানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে নিজেরই অভ্যাস-বিশ্বাস-সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এমনকি

ভট্টাচার্য, তপোধীর : *হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি': দেশভাগ ও প্রব্রজনের ভিন্ন আখ্যান*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৯-২২

সাহিত্যিক ও নান্দনিক ভিত্তিভূমি ও অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেও এই যুদ্ধ। কেননা আখ্যানের নতুন আদল খুঁজতে গিয়েই কথাকার উপলব্ধি করেন নিদারুণ 'Experessive vacuum'-এর যথার্থ বিকল্প তাঁকে বের করতে হচ্ছে।

এই উপলব্ধি হয়েছিল অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্যের পুরোধা গল্পকার হাসান আজিজুল হকেরও যখন তিনি মাটির সোঁদা গন্ধ মাখা আখ্যানের নতুন ঘরানার কথা ভাবলেন। লিখলেন 'আগুনপাখি' (২০০৬)। এর আগে হাসান উপন্যাস-তুল্য বয়ান লিখেছিলেন। কিন্তু নিজের লেখালিখি সম্পর্কে তিনি খুব খুঁতখুঁতে, আপসহীন ; তাই বৃত্তবন্দি থাকলেন না কোনো দিন। এই আখ্যানই (না, 'উপন্যাস' অভিধাটি ব্যবহার করব না) তাই তাঁর প্রথম শিল্পিত প্রতিবেদন এবং সার্থক। দেশ-কাল-ইতিহাস নয় কেবল, আত্মবিনির্মিত ব্যক্তিসত্তার সাহসী অস্তিত্বেরও মুখোমুখি হই এতে। আর প্রচ্ছদ-লিপিতে যেমন জানানো হয়েছে,

> আমরা পেছনে ফিরে স্মরণ করতে পারি সাতচল্লিশ-পূর্ব অখণ্ড এই ভুবনভাঙার উত্থান-পতন, নির্মাণ ও ক্ষয়। রাঢ়বঙ্গের এই ধূলিধূসরিত জনপদের এক নারীর জবানিতে উঠে এসেছে জীবন মন্থনের অমৃত ও গরল যা সমষ্টির নিজেরই বিষয়। গড়িয়ে আসা বিবিধ রাজনৈতিক তরঙ্গ উপলব্ধি ও জাগরণ, বিশ্বযুদ্ধের অসহ্য তাপ, মানবতা-লাঞ্ছিত মন্বন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শেষাবধি দেশভাগ ঝলসে দেয় কোটি কোটি হৃদয়। মাটি-লগ্ন এক নারীর বসতভিটে আগলে দেশত্যাগ অস্বীকার প্রকাশ করে ভ্রান্ত রাজনীতির ভেদনীতি, অসার দেশভাগ ও লড়াকু জীবন।

মোদ্দা কথা সবটাই প্রায় বলা হয়ে গেছে এখানে। তবে মূল কথাবস্তুর কাছে আসার আগে কথাশিল্পী হাসানের মনোভুবন ও সৃজনীর উদ্দীপনার প্রেরণাভূমি সম্পর্কে কিছু ধারণা করে নেওয়াটা জরুরি। 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকায় প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে হাসান জানিয়েছিলেন : 'আঙ্গিক আমার কাছে আর কিছুই নয়, বিষয়বস্তুর সবচেয়ে সম্পূর্ণ, সংগত সংহত প্রকাশকেই আমি আঙ্গিক বলি।' 'আগুনপাখি' নামক আখ্যানে বয়ানের ভাষা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। এর অন্তর্বস্তুর সংহত ও সংগত প্রকাশ এই বিশেষভাবে নির্মিত শিল্পভাষা ছাড়া হওয়া সম্ভব ছিল না। সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজন ও পরিণামে দেশভাগ বাঙালির অস্তিত্ব ও ইতিহাসকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিলেও এত বড় মহাকাব্যিক বিষয়ও দুই বাংলার সাহিত্যে কার্যত অনুপস্থিত উপস্থিতি হিসেবে রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে হাসানের স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাঁর সমস্ত বক্তব্য বিনা বিতর্কে গ্রহণ করি বা না করি এতে সন্দেহ নেই যে দেশভাগ ও দেশত্যাগ শুধুমাত্র স্যাঁতসেঁতে আবেগ দিয়ে ধরা অসম্ভব। বাস্তবে যা পৈশাচিক হিংস্রতা ও চরম নিষ্ঠুর অমানবিকতার পথ ধরে এসে বহু প্রজন্মের শিকড়কে উপড়ে ফেলেছিল, আখ্যানে রূপান্তরিত করার জন্যে সাহিত্যিক বাস্তবের সংরূপকেও বিপুল ভার ও মর্মবিদারক তীক্ষ্ণতা ধারণ করার সামর্থ্য অর্জন করা আবশ্যক ছিল। বিশিষ্ট এই বাস্তবের অভিব্যক্তি যে ভাষায় ঘটবে, তা নিঃসন্দেহে প্রচলিত পণ্যলোভন উপন্যাসের ভাষায় সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে প্রমিত বা মান্যভাষার দাবি খাটবে না। বাস্তব থেকে উপাদান নিয়েই উপস্থাপিত কুশীলবদের জীবন-যাপন ও অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক ভাষার আদলে নতুন শিল্পভাষার নির্মাণ অনিবার্য।

'বাংলা ভাষারীতি : কথ্য অকথ্য লেখ্য' শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়ে খুবই চিন্তাপ্রসূ মন্তব্য করেছেন:

> মূল ভাষা বলে কিছু আছে কী না জানি না, তবে সকলের সামাজিক এবং প্রাতিস্বিক (ব্যক্তিগত) ব্যবহারের জন্য একটা গৃহীত ভাষা থাকেই— লিখিত, প্রমিত, মান যে নামেই তাকে ডাকা হোক না— বাংলা ভাষাতেও সেরকম একটা কিছু আছেই। অভ্যাসে সেটিকেই মূল ভাবা হয়।... এরকম গৃহীত মানভাষা কখনওই কারোর মৌলিক আকস্মিক উদ্ভাবন হতে পারে না।

এই নিরিখে যদি 'আগুনপাখির' আখ্যান-ভাষার নান্দনিক ও সামাজিক তাৎপর্য বুঝতে চাই, তাহলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এর নির্মাণে হাসানের সূক্ষ্ম ইতিহাসবোধ সক্রিয় এবং তিনি সামাজিক নির্মাণ ও ভাষার প্রাকৃতিক সংগঠন মনে রেখেছেন। নইলে একটি বিশিষ্ট অঞ্চল ও সময়ের যে বয়ান তিনি রচনা করতে চাইছিলেন; তাতে পৌঁছনো কঠিন হত। হাসানের উৎস ভূমি রাঢ়বঙ্গ; এতে সম্পৃক্ত হয়েছে তার পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন উপভাষাভাষী অঞ্চলে অবস্থানজনিত বাচনিক অভিজ্ঞতা। তিনি এই বয়ানের জন্য অতি যত্নে গড়ে তোলা জীবন্ত ও সমসাময়িক কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন। তা প্রমিত বা মান ভাষা কি না, এই নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না তাঁর। তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যক্ষ, স্থায়ী ও শরীরী বাস্তবতায় নিহিত করতে চাইছিলেন। তরল ও প্রবহমান মুখের ভাষার মধ্যে কী পরিমাণ সংযোগ-সামর্থ্য নিহিত রয়েছে, তা বড় চমৎকারভাবে স্পষ্ট হয়েছে এই আখ্যানে।

দুই

হাসান বিশ্বাস করেন, 'জীবনের ছাঁচ আর গতির টানে জীবকোষকলার মতো বেড়ে ওঠাই হচ্ছে ভাষার আন্তর ইতিহাস।' তাঁর এই বিশ্বাস যে কত সার্থক, তার প্রমাণ অন্তেবাসী-হয়েও— তেজস্বিনী এক নারীর বয়ানে। কেননা তা ওই আন্তর ইতিহাসে ঋদ্ধ। তা সাধারণ এক মানবীর ভেতরকার আশ্চর্য শক্তি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে আমাদের। আর, বুঝে নিই যে হাসান অত্যন্ত জরুরি এই বার্তা দিচ্ছেন আমাদের যে এই শিল্পভাষা নান্দনিক শর্ত পূরণ করেও প্রাকৃতিক ঝর্নার মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহমান। একই সঙ্গে তা ওই নারীর ব্যক্তিগত আবার সর্বজনীন। তাই এর প্রধান গুণই স্থিতিস্থাপকতা যা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটিয়েও মনন-অনুভবন সৃজনী কল্পনার উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম। অথচ এর মধ্য দিয়ে কথাকার ভাষারীতি সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত সংস্কার ও রক্ষণশীলতা চূর্ণ করে দিয়েছেন। এই তাঁর দ্রোহ, তাঁর বিনির্মাণ যেখানে তিনি প্রমিত ভাষার বাধ্যতামূলক নিয়মবিধির বশ্যতা স্বীকার করেননি। হাসানের কথা দিয়েই লিখি যে লিখন-নৈপুণ্যের জন্যেই তিনি এই আখ্যানে গোটা ব্যক্তিকে ধারণ করতে পেরেছেন, সাথে সাথে সমাজকেও। গভীর প্রজ্ঞা ও অনুভব থেকে তিনি বুঝেছেন যে যখন আমরা প্রমিত ভাষার আশ্রয়ে শিল্পভাষা নির্মাণ করি, সেসময় একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাষাও লিখি। একইভাবে আগুনপাখিতে প্রবহমান কথ্য ভাষার আশ্রয়ে যে শিল্পময় আখ্যান ভাষা নির্মাণ করেছেন, তা কথক নারীর ব্যক্তিগত ভাষাও বটে। আবার পড়তে পড়তে বুঝি, ব্যক্তিগত হয়েও তা সর্বজনীন। আর, এই বিপুল ভার বহনের সামর্থ্যে এর মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে বহুমাত্রিক ও নির্ভরযোগ্য ভাষা অবয়বের এমন একটি শক্ত মেরুদণ্ড, যা সব ধাক্কা সইতে পারে, সবরকম ধকল নিয়েও ভেঙে পড়ে না এবং চিন্তা-ভাবনা-আবেগ-কল্পনার তাপে গলে যায় না। এই বক্তব্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ খুঁজে পাই আখ্যানের উপসংহারে।

সম্পূর্ণ বয়ানই তো সেই গ্রামীণ নারীর বাচনে উপস্থাপিত যে সংসার-সমাজ-দেশ-ধর্মকে দেখেছে জীবন-ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আপাত দৃষ্টিতে প্রবলভাবে পিতৃতান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক চক্রব্যূহে সে বন্দিনী যেখানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পিঞ্জরগুলিকে বিনা প্রশ্নে মান্যতা দেওয়াই বিধি। নারীর যে কোনো আলাদা পরিসর বা কণ্ঠস্বর থাকতে পারে, তা কারো বিবেচনার মধ্যেই থাকে না। দেশভাগ ও তার অনুষঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেশত্যাগ, সবকিছুকে আমরা সবাই গভীর কোনো আত্মিক প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিয়েছি। কোনো প্রতিপ্রশ্ন কদাচিৎ উত্থাপিত হয়েছে; দুর্ধর্ষবেগে ধাবমান ইতিহাসের ঘোলাজলের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভেবেছি যে কোনো খড়কুটো আঁকড়ে না ধরে স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণই সময়ের বার্তা। তাই কোথাও কখনও জোরালো প্রতিবাচন তৈরি করার চেষ্টা হয়নি। ইতিহাসের মারাত্মক ভ্রান্তি কোনো ব্যক্তি সংশোধন করতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদ তো অন্তত জানিয়ে রাখতে পারে। এই কাজটিই করেছে 'আগুনপাখি'র কথক

নারীটি। তার জীবনমন্থনজাত সংসার ভেঙে গেছে, সমাজের পরিচিত আবহ ধূসর হয়ে গেছে, দেশের মাটি ও আকাশ সরে যেতে বসেছে, ভেঙে গেছে ধর্ম সম্পর্কে নির্ভরতাও। সবশেষে তার স্বামী-পুত্র সহ প্রত্যেকেই চিরদিনের মতো নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে অন্যত্র, নতুন 'স্বদেশ' খুঁজে পাওয়ার ব্যগ্রতায়। আর, তখনই চির-নিরুচ্চার অন্তেবাসী নারীর মধ্যে আশ্চর্যভাবে জেগে ওঠে ব্যক্তিস্বর, ব্যক্তি অস্তিত্ব, ব্যক্তি সত্য।

আখ্যানের যে উপসংহারের কথা লিখছি, তা আসলে সম্ভাব্য নতুন ইতিহাসের সূচনাবিন্দু। সেখানে ব্রাত্য নারীর দ্রোহ অনুরণিত হয় বিভাজনের সর্বনাশা মিথ্যা-ইতিহাসের বিরুদ্ধে। নিজের প্রতি তার যে-প্রশ্ন, তাতে দ্বিধার জড়তা নেই, আছে অতলান্ত মূঢ়তা ও সর্বজনীন অন্ধতার মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রত্যয়ন দীপ্ত মানবীর আত্ম-অন্বেষণ :

> আমি কি ঠিক করলম? আমি কি ঠিক বোঝলম? সোয়ামির কথা শোনলম না, ছেলের কথা শোনলম না, মেয়ের কথা শোনলম না। ই সবই কি বিত্তি-বাইরে হয়ে গেল না? মানুষ কিছুর লেগে কিছু ছাড়ে, কিছু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শ্যাষে একটি কথা মনে হল, আমি আমাকে পাবার লেগেই তো কিছু ছেড়েছি।

গভীরতার ব্যঞ্জনায় এ যেন মহাকাব্যিক মুহূর্ত। যে-যুদ্ধে কোনো অস্ত্রশস্ত্র কাজে লাগে না, কেউ থাকে না সহায়ক, যে-যুদ্ধ বিরলে একাকী নিজের সঙ্গেই প্রথম করতে হয়— সেই মুহূর্তই এসেছে ওই নারীর কাছে যে প্রকৃতপক্ষে সময় ও জাতির সন্ধিক্ষণে উত্তীর্ণ হয়েছে বিবেকের মর্যাদায়। কিন্তু বাঙালির ইতিহাসে যেমন হয়েছিল— শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, কিরণশংকর রায়, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা কেউ শোনেনি— বরং ধর্মীয় আধিপত্য কায়েম রাখার স্বপ্নে বিভোর একচক্ষু হিন্দুরা খণ্ডিত ভারত এবং একচক্ষু মুসলমানেরা পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই আখ্যানের অণুবিশ্বে বিবেকের কণ্ঠস্বর অপরিমেয় বেদনা নিয়ে হয়ে উঠল নির্জন একক। যে বিবেকের ভূমিকা নেয়, তার ট্র্যাজিক কারুণ্য অতলস্পর্শী কেননা আত্মজিজ্ঞাসায় বিদীর্ণ হতে হয় তাকে আখ্যানের ওই নারীর মতো : আমি কি ঠিক করলাম? আমি কি ঠিক বুঝলাম? স্বামী-সন্তান-ভাই-পরিজনের উপরোধ উপেক্ষা করলাম জীবন-মন্থন-জাত অনুভবের সত্য আঁকড়ে ধরার জন্যে। তারপর কি অবাধ অগাধ শূন্যতা নাকি এই নিবিড়তম উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হওয়া: সত্যের জন্যে সবকিছুই ছেড়ে দেওয়া যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্যেই সত্যকে ছাড়া যায় না। তা-ই তো করেছে হাসান-সৃষ্ট ওই অসামান্য নারী যার সাধারণত্বেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বজ্রতুল্য শক্তি।

তাই আখ্যানের শেষে সব-গাছ-ছাড়ানো তালগাছকেও ছাড়িয়ে গিয়ে আকাশ স্পর্শ করে। বড় কিছু একটা পাওয়ার জন্যে মানুষ সামান্য কিছু ছেড়ে দেয়— এই তো দুনিয়াদারি। কিন্তু যে-নারী স্বয়ং আগুনপাখি, পারিপার্শ্বিক দাউদাউ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আর আগুনে তার পাখা ঝলসে গেলেও, সে জানে যে আস্তিত্বিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিকড় উপড়ে নিয়ে কোনো কল্পিত পবিত্রস্থানের উদ্দেশে ঝাঁপ দেওয়া অনুচিত। আর, সবকিছুকেই ছাপিয়ে ওঠে তার এই উপলব্ধি; আমি আমাকে পাওয়ার জন্যেই এতকিছু ছেড়েছি। যে-উপলব্ধিতে বহু তথাকথিত শিক্ষিতজন পৌঁছতে পারে না, গ্রামীণ অশিক্ষিত নারী সময়ের দহনপর্বের মধ্য দিয়ে সেই আস্তিত্বিক বোধে উত্তীর্ণ হল। এর তাৎপর্য কত অনেকান্তিক, তা তার ঠিক পরবর্তী আত্মমন্থনের সূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> আমি সবকিছু শুধু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলাদা একটো দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুধু মোসলমানেরা থাকবে কিন্তু হিঁদু

> কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়। আমাকে আরও বোঝাইতে পারলে না যে ছেলেমেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকে সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।

বড় তীব্র, বড় মৌলিক, বড় শাণিত এই উচ্চারণ। এবং, চূড়ান্ত সাম্প্রতিক। দাম্পত্য জীবনে যত নিবিড়তাই থাক, স্বামী ও স্ত্রী আলাদা সত্তার অধিকারী এই উপলব্ধি চিরাগত সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ের প্রত্যাখ্যান যা সম্পর্কের নামে বন্দিশালা তৈরি করে। এভাবে হাসান একঢিলে অনেক পাখি মেরেছেন। কেননা সেইসঙ্গে দেশভাগ হওয়ার সুবাদে দেশ ত্যাগ করার যে প্রধান যুক্তি শৃঙ্খলাকেও পরাভূত করতে চেয়েছেন। এই নারীর বাচন যদি দেশ বিভাজনের সময় আরও কয়েকজন বাস্তবের নারী ও পুরুষ অনুসরণ করত, তাহলে ইতিহাস হয়তো এমনভাবে অন্ধকূপে ঝাঁপিয়ে পড়ত না।

বিশেষভাবে চর্যাপদের, চণ্ডীদাস আলাওলের, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলায় কেন এত নিশ্ছিদ্র আত্ম-বিস্মরণের দেশভাগ : এই জিজ্ঞাসার বিপন্নতা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করল না কেন— হাসান নিশ্চিত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। যেহেতু তিনি সৃজনশীল লেখক, ইতিহাসের ঘটমানতাকে নতুন সম্ভাবনা ভাষ্যে ব্যক্তি-সত্তায় ও ব্যক্তির আপন কাহিনি নির্মাণে কিংবা বিনির্মাণে প্রতিস্থাপিত করেছেন। ইতিহাসে যা ঘটে গেছে, আখ্যানকার তাকে পালটাতে পারেন না ; কিন্তু তার মধ্যে নিহিত অন্ধবিন্দুগুলির প্রতি দৃষ্টি নিশ্চয় আকর্ষণ করতে পারেন। 'ভবিষ্যৎ অতীত' এর উপস্থিতি আবিষ্কার করে ওই গ্রামীণ নারীর মতো এমন ব্যক্তি-সত্তাকে নির্মাণ করতে পারেন যে সমষ্টির ভ্রান্তির শিকার হয় না ; এমনকি, নির্মাণ অন্ধমূঢ় সর্বজনের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। চোখে আঙুল দিয়ে যে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নিজস্ব সত্যকে নিজের মতো করে, জেনে নেওয়ার অধিকার তার আছে। সে অন্যের চোখ দিয়ে দেখবে না তার আপন অভিজ্ঞানকে। যে পাকিস্তান গোঁজামিলের সৃষ্টি, তাকে ওই নারী প্রত্যাখ্যান করে। তাই বলে, কীভাবে হিন্দুর দেশ আলাদা এবং মুসলমানের দেশ আলাদা হয়ে গেল— তা যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়নি। ধর্মীয় ভিত্তিতে কি জমি-নদী-আকাশ-সকাল-সন্ধ্যাকে বিভক্ত করা যায়? আলাদা কিসের তবে। নেহরু-জিন্না কিংবা তাদের কংগ্রেস-মুসলিম লিগ যে পাটিগণিতকে অনুসরণ করেছে, তার প্রাসঙ্গিকতাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে আখ্যানের কথক ওই আগুনপাখি নারী। অন্য আরেকটা জায়গা, যার প্রকৃতি-বাস্তব সে জানে না, শুধুমাত্র মুসলমান বলেই তার দেশ হয়ে উঠবে কেন? আর যার আলো-হাওয়া-রোদ শরীরে ও আত্মায় মেখে সে শিশু থেকে প্রবীণ হয়েছে, তা আচমকা কেন তার দেশ আর থাকবে না। মোক্ষম এই প্রশ্নের সামনে ইতিহাস নিরুত্তর ছিল। ষড়যন্ত্রনিপুণ আততায়ীদের যুক্তিই সত্য-মিথ্যা স্বদেশ-বিদেশ নির্ধারণ করেছে। হাসান এই অত্যন্ত জরুরি কথাটি আখ্যানের শিল্পভাষায় ব্যক্ত করলেন যা এতদিন বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষিত ছিল।

তিন

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দেশভাগ হওয়ার সময় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি নানাভাবে এমন-একটা পরিস্থিতি তৈরি করল যে জনগণ বেশ কিছুদিনের জন্যে অন্ধতার মড়কে আক্রান্ত হয়েছিল। জনমত হয়ে উঠল দেশ বিভাজনের পক্ষপাতী। তখন যাঁরা পথ দেখাতে পারতেন, সেইসব নেতারাও ছিলেন প্রবলভাবে অদূরদর্শী। হাসান দেশভাগ সম্পর্কিত অতি সংক্ষিপ্ত বাচনে জানিয়েছেন, বাংলা বিভাজনের সর্বনাশটা কতদূর

গড়াতে পারে— সেই ধারণা কোনো পক্ষের ছিল না। এ-প্রসঙ্গে হাসান যে-কথাগুলি বলেছেন তা বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ নামক অনুপস্থিত উপস্থিতিকে বুঝতে খুব সাহায্য করে। অবিভক্ত ভারতে অতিদ্রুত রাজনীতির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটে যাওয়াতে অবাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের কূটনৈতিক ধূর্ততায় বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান ভাষিক জাতীয়তার বাস্তব ভুলে গেল। একদিকে হিন্দি এবং অন্যদিকে উর্দু ও পাঞ্জাবি-ভাষী পুঁজিবাদীদের বাজার নিষ্কণ্টক করার জন্যে অদূরদর্শী বাঙালি যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান হারাতে বসেছে, সেই সার্বিক সর্বনাশ কারো নজরে পড়েনি। ধর্মতন্ত্রের ফাঁসুড়েরা পুঁজিবাদী শক্তির লেজুড়ে পরিণত হয়ে সাধারণ মানুষকে ডুবিয়ে দিল আদিগন্ত ব্যাপ্ত চোরাবালিতে। পশ্চিমবঙ্গের বিশাল হিন্দু সম্প্রদায় এবং পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু মুসলিমরা দেশত্যাগের বিভীষিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। বরং তখন তাঁরা আহ্লাদিত হয়ে কল্পস্বর্গের সুখস্বপ্ন দেখতে-দেখতে কালনেমির লঙ্কাভাগ করছিলেন। হাসান বলেছেন, 'দুই সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ— যাঁরা পূর্ববঙ্গ অথবা পশ্চিমবঙ্গে বাস করতেন— বিভাজনের করুণ ও ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের কি কোনো ধারণা ছিল? প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগের শিকার হয়েছেন, ভোগ-ভোগান্তির মোকাবিলা করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের সেই অংশ— যাঁরা নিপীড়িত, বিতাড়িত, নিগৃহীত ও অপমানিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুসলিমকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁরাও যে বিভাজনের কুফল ভোগ করেছেন এ ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে যাঁরা দেশত্যাগের মহাযাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, নির্মোহভাবে তাঁদের অনুপাত হিসেব করলে তাঁদের দুর্গতি ও পরিণাম বিবেচনা করলে, তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রবিমুখতার কথা ভাবলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর সংখ্যার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের দেশত্যাগী মুসলিমদের সংখ্যা অনেক অনেক কম। এবং তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি রাষ্ট্রীয় বিমুখতার সম্মুখীন হননি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের বহু সম্পন্ন মুসলিম চাকরি বাকরির সন্ধানে, উন্মুক্ত পরিবেশের সুযোগ গ্রহণের কথা ভেবে দেশ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন।' (বাচনিক আত্মজৈবিক : পৃ. ৮৪)

অত্যন্ত জরুরি এই কথাগুলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। 'আগুনপাখি'-র বয়ানে ফিরে যাওয়ার আগে মাঝখানে ছোট্ট একটি শাখাপথ ঘুরে আসব শুধু। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'-এর প্রেক্ষিতও দেশত্যাগ করে নতুন বাসস্থানের খোঁজে এসে সব-খোয়ানো পরিবারের ধূসর বৃত্তান্ত। গল্পকৃতির শুরুতেই চিহ্নায়িত বাচনে হাসান মর্মবস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন,

> গঞ্জের রাস্তার ওপর উঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামরে মুমূর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মতো ছায়া পড়ে শিয়ালটারও... বড় পুলের ওপর থেকে নিচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় সরদারদের ছোট তরফের বড় ছেলে ইনাম। ... সেখানে শঙ্খচূড়ের মতো দেখায় যে ধবল পথ, এখন তা ত্রস্ত হয়ে এলো, ফেকু বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল, তার পেছনে সুহাস।

মনে হয় নাকি, চলচ্চিত্রের ভাষায় কথা বলছেন হাসান। একটু পরেই বুঝতে পারি, দেশ ত্যাগ করে আসা সর্বহারা কোনো পরিবারের তরুণী কন্যাকে সামান্য টাকার বিনিময়ে ভোগ করে তারা। আর, পরিবারের বুড়ো কর্তা বুঝেও না-বোঝার ভান করে যায়। দেশত্যাগের মহাযাত্রায় যে দুর্গতি ও পরিণামের কথা লিখেছেন হাসান তার মর্মন্তুদ নিষ্করুণ কলম-ছবি তৈরি করেছেন হাসান। আমরা যারা এর শিল্প নৈপুণ্যকে বাহবা দিয়েছি, কথকতার প্রেরণা-উৎস সহ ওই পরিণামের কলুষে পৌঁছনোর প্রস্তুতি কিন্তু লক্ষই করিনি :

> লাল আলো আসছে কাঠের রড লাগানো জানলা দিয়ে। মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখে

> ঝিলিক। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজপাখিটা নড়েচড়ে বসল। ...জানলার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়ো মানুষ চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো— অ্যাঁ? লাল আলোটা সরে যায়, জানলা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হ্যারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙ্গির নিচে শুকনো দুটো পা। গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইমানকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে...।

এই বিবরণে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ— সমস্ত চিহ্নায়িত। তিনজন সুযোগ সন্ধানী লুম্পেন তরুণ প্রতিস্থাপিত হয়েছে এমন এক বুড়োমানুষ লোকটার বিপ্রতীপে যার পেছনে 'সব কালো এবং নির্জনতা'। জীবনের নির্মম প্রহারে বিধ্বস্ত সে যার ইশারা রয়েছে আঁকিবুকি ফাটলযুক্ত মাটির সঙ্গে তার মুখমণ্ডলের প্রতিতুলনায়। তার ছায়াময় অস্তিত্ব নিয়ে সে অসহায় ; নিরুপায় আক্রোশে সে শুধুই দৃষ্টি দিয়ে বিধঁতে পারে দুপুররাতে অনাহূত উপস্থিত তিন সমাজ-বিরোধীকে, যারা মাত্র দুটাকার বিনিময়ে তার তরুণী কন্যার শরীর ভোগ করতে এসেছে। তবু তাদের আহ্বান জানাতেই হয় কেননা স্বদেশ-বিচ্যুত উদ্‌বাস্তুর অতীত মুছে গেছে আর বর্তমান নিরালম্ব, ভবিষ্যৎ অস্তিত্বহীন। হাসান এই কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন তথ্যটি জানিয়েছেন ওই বুড়োমানুষটির জবানিতে, যে কি না অ্যাজমার কষ্টে নিঃশ্বাসের মধ্যেও নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য অজস্র কথা বলতে থাকে। আর, তখনই শাণিত ছুরির মতো অর্ধমনস্ক পাঠকের মেধায় হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হয় এই কথাটি— 'এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।' যেন দাবানলে পুড়ে-যাওয়া প্রান্তরের উপর দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ার মতো উড়ে আসে এই মর্মান্তিক স্বর— দেশ যে ছেড়েছে তার ভেতর ও বাহির একাকার। বলা বাহুল্য ওই তিনটে কাম-তাড়িত তরুণ ওই স্বর শুনেও শোনেনি। আমরা পাঠকেরাও কি শুনেছি? লক্ষ কি করেছি ফেলে আসা স্বাদেশিক পরিবেশের জন্যে সময়-সন্তপ্ত মানুষটির আর্তি—

> তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হত এই জঙ্গুলে জায়গায়— বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম... আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের।

এই যে শুকনো দেশের লোকের পক্ষে জঙ্গুলে জায়গায় থাকার অস্বাচ্ছন্দ্য— তা যে ছলনাময় ইতিহাস সঞ্চালিত আত্ম-প্রতারণা, এ কথা না লিখলেও চলে। প্রায় অনুরূপ উচ্চারণের মুখোমুখি হই হাসানের 'উত্তরবসন্তে' গল্পে। সে-প্রসঙ্গ একটু পরে। আপাতত লক্ষ করব দুর্বহ আত্ম-প্রতারণায় বুড়োর মাথা নেমে আসে ঝুলন্ত কাঁধের উপর। ঘরের ভেতর থেকে চুড়ি ও এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর সুহাসের কামুক লালাসিক্ত হাসি শুনতে-শুনতে বুড়োর যে কথা পাঠককে উপসংহারে পৌঁছে দেয়, তাতে শিউরে ওঠে অন্তর। আর, বাংলা গল্পবিশ্বের অন্যতম সেরা সমাপ্তিবিহীন উপসংহার ঝলসে দেয় আমাদের স্তম্ভিত বিবেক আর দেশভাগ নামক অনুপস্থিত উপস্থিতি সম্পর্কিত সামূহিক স্মৃতিলোপকে।

> বুঝলে যখন এখানে এলাম... আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই... ফুলের জন্যে নয়,... বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।

> আবার হুঁ হুঁ ফোপানি এলো আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ— প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো— এ্যাহন তুমি, কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

যারা দেশ ত্যাগ করে নতুন স্বপ্নের দেশে এল, রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষে স্বপ্নের মোহ-কাজল মুছে যেতে দেরি হয়নি। কিন্তু তাদের তো ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না কোনো। বেঁচে থাকার জন্যে তাদের বরং নানারকম সমঝোতা করতে হল। কিন্তু এই সমঝোতার মূল্য চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে পান করতে হল কালকূট। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' এই প্রক্রিয়ারই অসামান্য প্রতীকী আখ্যান। এরই সঙ্গে তুলনীয় হল হাসানের 'উত্তর বসন্তে' ও 'ঘরগেরস্থি'। 'উত্তরবসন্তে'-র প্রারম্ভিক বাক্য এরকম— 'অন্ধকার বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।' আর প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য হল— 'এ বাড়ির শূন্য অভিশপ্ত ঘরগুলোর কোণে কোণে দৈত্যের মতো গাছগুলির গোড়ায় রাতের অন্ধকার জমে রয়েছে।' এই চিহ্নায়িত অন্ধকার দেশত্যাগী মানুষের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। রাঢ়বঙ্গ থেকে বিনিময়-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা পাকিস্তানে এসেছেন, আলো তাঁদের জন্যে অধরা রয়ে গেছে। হাসানের গল্পভাষায় উঠে আসে 'নিরন্ধ্র অন্ধকার', 'বাড়ির ভেঙে পড়া ছাদ' এবং 'ভিজে ভিজে অসন্তুষ্ট বিমর্ষ'— গলায় মায়ের একঘেয়ে বিলাপের কথা। কোনটা যে স্বদেশ আর কোনটা বিদেশ ছিন্নমূল মানুষ তা বুঝতে পারে না। গল্পকৃতির বহুস্বরিক বিলাপের ভাষা এই বার্তাই বয়ে আনে যেন— 'সকাল কী এ বাড়িতে হবে না? ছি ছি, এই জঙ্গলে মানুষ বাস করে?' একটু আগে লক্ষ করেছি, 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'-এ বুড়ো মানুষটিও 'জঙ্গুলে জায়গা'-র (দেশ কথাটি এক্ষেত্রে উচ্চারিত নয়) তুলনায় নিজের ছেড়ে-আসা 'শুকনো দেশ' ও 'আলাদা ভাবধারা'র কথা বলেছে। 'উত্তরবসন্তে'র গল্পকৃতিতে মা আর আব্বার মতো বয়স্ক মানুষের জন্যে স্মৃতি হয়ে উঠেছে বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে উল্লেখ করি, হাসান একটি সাক্ষাৎকারে শাহাদুজ্জামানকে জানিয়েছিলেন যে দেশবিভাগের ক্ষত চিরকাল তাঁর মধ্যে থেকে যাবে কেননা এর চেয়ে বেশি অর্থহীন আর কিছু নয়,

> আত্মজা ও একটি করবী গাছের ওই বৃদ্ধদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো জীবন আমি দেখেছি। আমার 'উত্তরবসন্তে' প্রায় পারিবারিক স্মৃতিতে ভরা। এ সবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তবে আমি চেষ্টা করেছি, এগুলো যেন একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।

চার

সংবেদনশীল স্রষ্টাই জানেন, যা ব্যক্তিগত তা-ই সামাজিক। উলটো করে এও বলা যায় যে যা সামাজিক তা-ই আবার ব্যক্তিগত। এমনকি দেশভাগ ও দেশত্যাগের মতো অনেকান্তিক তাৎপর্য সম্পন্ন ঘটনার ও যার পরে, আমাদের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিয়েছে, পুরনো ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তা মর্মান্তিকভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। কেউ কেউ নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকেই প্রত্যাখ্যাত করে আর কেউবা নিঃশব্দে ডুবে যায় চোরাবালিতে। যেমন 'উত্তরবসন্তে' গল্পে হতাশ অন্ধকার দলা পাকিয়ে থাকে এবং হ্যারিকেনের কালিতে কাচ ভরে যায়। দৃষ্টি সেখানে রুদ্ধ, জীবনের চলিষ্ণুতা বিপর্যস্ত। তা-ই 'কী দিনে কী রাতে ওর একটাও জানালা খোলেন না আব্বা। দিনের বেলাতেও মশারির ভিতর হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পাথরের মতো বসে থাকেন আব্বা। আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন কারণে অকারণে। আব্বাকে ভাবতে গেলেই তাঁকে আর আলোর জীব বলে মনে হয় না। অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে যেন জীবন্ত বলেই মনে হয় না।' দেশভাগ শুধু বাস্তু কেড়ে নেয়নি, দিয়েছে পারাপারহীন ও প্রতিকার শূন্য আত্মগ্লানি। স্তব্ধ ঘরের ভেতর থেকে রুগ্ণগলায় বৃদ্ধের আর্তি 'মহাপাপ

করেছি জীবনে, মহাপাপ করেছি' আসলে কোনো একক বাচন নয়, তা ইতিহাসের নিষ্ঠুর অভিঘাতে অনিকেত হয়ে যাওয়া মানুষের সামূহিক বাচনেরই দৃষ্টান্ত। শুধু মা ও আব্বাই নয়, বাণী ও তার ছোটভাই রঞ্জু আর আগের মানুষ থাকে না। কবীরের সঙ্গে তার অকালমৃত দিদি লিপির প্রেম যেমন অলীক, তেমনি বর্ধমানের পুরনো জেলা শহরের লাল রোদও ধরাছোঁয়ার বাইরে। দেশত্যাগ তাদের অসুস্থ করে দিয়েছে, তাদের আর কোনো অধিকার নেই জীবনে। এই দুর্বহ বেদনার কোনো শেষ নেই। কেননা বাস্তুহীনদের প্রব্রজন বর্তমানকেও কৃষ্ণবিবর করে তুলেছে।

পাশাপাশি 'ঘরগেরস্থি' গল্পে রামশরণ ও ভানুমতির মতো ব্রাত্যজনদের জীবন ও মৃত্যু সমার্থক। এই গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রয়েছে বহুদূরবর্তী দিগন্তের মতো। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যেমন তাদের নিত্যসঙ্গী, তেমনি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নিঃস্ব হওয়াও। বাংলাদেশে ফেলে-যাওয়া যে ভিটের আশায় তারা ফিরে আসে ভারতের বিভিন্ন উদ্‌বাস্তু শিবিরে অজস্র নরক পরিক্রমা করে, সর্বত্রই একই ইতিবৃত্ত। বারেবারে তারা শুধু ভিতহারাই হয় এবং ফিরে এসেও দেখে গ্রাম এবং নিজের ভিটেকে সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। হাসান এখানেও ছোটগল্পে নিজস্ব ভাষায় মূল কথাটি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন—

> স্বাধীন হইছি আমরা— ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চির খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরানের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয়—৯টা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইস্টিশান, কাল জাহাজঘাট— রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনতা কি, আঁ? আমি খাতি পালাম না— ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনতা কোঁয়ানে?

এমন স্পষ্ট বক্তব্যের পরে আর কোনো কথা থাকে না। স্বদেশকে পাওয়ার জন্যে দেশত্যাগ করে রামশরণের পরিবার এবং নরকযন্ত্রণা সহ্য করে ফিরেও আসে বাংলাদেশের ভিটেয়। দেখে সব নিশ্চিহ্ন, সব পুড়ে ছাই। সত্যিই তো, দেশ তবে কোথায় এবং দেশ কাদের। এভাবে ১৯৪৭ পরবর্তী আরেক ঐতিহাসিক দেশত্যাগ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া থেকে নিষ্কর্ষহীন নিষ্কর্ষ নিঙড়ে নিয়েছেন হাসান। বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বপ্ন দিয়ে গড়া কোনো দেশ কোথাও নেই আর তাই স্যাঁতসেঁতে আবেগ দিয়ে তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না।

আবেগ আর অনুভব সমার্থক নয়। স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার গ্রন্থনায় যাকে তিলে-তিলে গড়ে তোলা হয়, তা বাস্তবের কোষে-কোষে মধুক্ষরণ করে। সেই জন্যে তা সত্তার শরিক যাকে কোনো কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করা চলে না। হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পকৃতিগুলিতে গভীরতর জীবনসত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্যাস দিয়ে রচিত হয়েছে 'আগুনপাখি'। আর, তাই এ তাঁর ম্যাগনাম ওপাস। 'বাচনিক আত্মজৈবনিক' বইয়ের পূর্বোদ্ধৃত নিবন্ধে হাসান উপলব্ধিতে বিধৃত বঙ্গীয় বাস্তবতা ও তার সাম্প্রদায়িক মেরুকরণজনিত সীমাহীন মূর্খতার কথা লিখেছেন। দেশভাগ ও দেশত্যাগের তাৎপর্য বুঝতে চাইলে 'এই পুরো হিসাবটা মাথায়' রাখতে হবে। এই নিরিখে তিনি জানিয়েছেন,

> বাংলা সাহিত্যে কেন মহাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে ওই বিভাজন, ওই বিপর্যয়, ওই করুণ পরিণতি উঠে আসেনি, তার কারণ কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? শুধু বুক চাপড়ানো, মুখে খই ফোটানো ছাড়া এমন কি কিছু লেখা হয়েছে, যা উল্লেখ করার দাবি রাখে? কিছু কিছু লেখার ফাঁক দিয়ে তলিয়ে গেছে বিভাজনের ক্ষত। রক্তাক্ত যন্ত্রণার যে অভিজ্ঞতা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারও হওয়ার কথা নয়।

খুবই যথার্থ এই মন্তব্য। এই 'বিভাজনের ক্ষত', 'রক্তাক্ত যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা' সরাসরি বুঝে নিতে হয় ; পরোক্ষ বর্ণনার সূত্রে এই ক্ষত, এই যন্ত্রণা কখনওই স্পষ্ট হতে পারে না। হাসান এই বয়ানে যে 'রাষ্ট্রীয় বিমুখতার সম্মুখীন' হওয়ার কথা বলেছেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান গত ৬৫ বছর ধরে তার কদর্যতম ও হিংস্রতম চেহারা দেখে আসছেন। দিন-দিন তা উৎকট থেকে আরও উৎকট হয়ে উঠছে। এঁদের আজ পর্যন্ত ঘর হল না তাই। সর্বত্র তবু অন্তরে-বাহিরে। দেশভাগ নামক আদিপাপের বোঝা বাধ্যতামূলকভাবে দেশত্যাগ করার পরে প্রব্রজিতদের সন্ততিরাও বয়ে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে এই মানবগোষ্ঠী নামেমাত্র স্বভাষী, আসলে এরা পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত অপাঙ্‌ক্তেয় অপর। কেননা ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে যদি বাংলার ভাষিক অভিজ্ঞান ক্রমশ বিপন্নও হয়ে থাকে, ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুতেই আগ্রহ খুব একটা দেখা যায় না। আর পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল মুসলমানদের আপন ভূমি হিসেবে দেশত্যাগী প্রব্রজিতদের সংখ্যা যেহেতু বিশাল— বহু প্রজন্মের ভিটেমাটি ছেড়ে সাংস্কৃতিক শেকড় উপড়ে ফেলার মধ্যে অনেকেই দেখেছিলেন ঈশ্বর-প্রদত্ত বৈষয়িক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের অভূতপূর্ব সুযোগ। যত বছরের পরে বছর পেরিয়ে গেছে, ইতিহাসের ভ্রান্তি পুনঃপাঠ বা সংশোধন করার কোনো তাগিদও আর অবশিষ্ট রইল না। এমনকি, স্মৃতিপীড়াও হল অপ্রাসঙ্গিক। যাদের শিকড়ের কোনো স্মৃতিই নেই, তাদের স্মৃতিপীড়া কিসের। ফলে, কে আর ভাবে দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে। এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার।

হাসান আজিজুল হকের আছে শেকড়ের প্রত্যক্ষ স্মৃতি। তাই তিনি 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'উত্তর-বসন্তে', 'ঘর গেরস্থি'র মতো ছোটগল্প লেখেন। বিবেকের মরচে ধরা কৃপাণে শাণ দিতে নিবন্ধ লেখেন। আর লেখেন 'আগুনপাখি'র মতো মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি-গভীরতা-ব্যঞ্জনা সম্পন্ন আখ্যান। আরও জানান, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারও রক্তাক্ত যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা থাকলেও যদি 'সর্বব্যাপিনী প্রীতি' ও কল্পনা-সঞ্জাত, রচনা-সামর্থ্য না থাকে— আখ্যান জন্ম নেবে না। 'বুক চাপড়ানো' বা 'মুখে খই ফোটানো'-র কথা লিখছি না। হাসান উল্লেখ না-করলেও পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি উপন্যাস প্রকল্প দেখতে পাই। কিন্তু সাধারণভাবে দেশভাগ ও প্রব্রজন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের মধ্যে চূড়ান্ত অনাগ্রহই চোখে পড়ে। তার মানে, আবহমান বাংলার মানচিত্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বহুধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এতে তাঁরা প্রকৃত কোনো পীড়া বোধ করেনি। এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারতের যুদ্ধরত বাঙালিরাও ছিন্নমূল হয়ে পুনর্বাসনের জন্যে আজও জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে সহাবস্থান করতে বাধ্য হয়েও এই মহৎ অন্তর্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হননি। সাম্প্রতিককালে শেখর দাস লিখেছেন 'বিন্দুবিন্দু জল' আর রণবীর পুরকায়স্থ লিখেছেন 'সুরমা গাঙর পানি' নামে দুটি ব্যতিক্রমী আখ্যান। এবার ফিরে যেতে পারি হাসানের বক্তব্যে—

> তাই বড়জোর দু-একটা বিষাদবৃক্ষ বা পূর্ব-পশ্চিম রচিত হতে পারে, কিন্তু বড় সৃষ্টি সম্ভব নয়, তা হয়নি। আরেকটি কথা, দেশভাগে কি পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলিমরা খুশি হয়েছিলেন ? তাঁদের বড় অংশ তো দেশ ত্যাগ করেননি। যাঁরা সুবিধাভোগী, সুযোগসন্ধানী— তাঁরাই আপ্লুতবোধ করেছিলেন। স্বেচ্ছায় ভিটে ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। হ্যাঁ, সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা দাঙ্গার পর, নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে এপারে এসে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। তাঁরাও সরাসরি ভুক্তভোগী। ওই অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু সাহিত্যকে স্পর্শ করেছে। (বাচনিক আত্মজৈবনিক)

পাঁচ

'আগুনপাখি'-তে কথক-নারীর স্বামী-পুত্র সহ পরিবারের অন্যেরা হয়তো মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রের কথা

ভেবে আপ্লুত বোধ করেছিল। কিন্তু 'স্বেচ্ছায় ভিটে ছেড়ে চলে' এসেছিল কি। এই ইচ্ছাও তো সমসাময়িক কিছু ঘটনা, মূলত সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং তার থেকে প্রবল মড়কের মতো সংক্রমিত ভীতিরই ফসল। মূল সংকট ছিল বিশ্বাসের। যারা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে সহাবস্থান করে এসেছে, মাঝেমধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলেও আগে কখনও অবিশ্বাসের বিষক্রিয়া এমনভাবে আচ্ছন্ন করেনি, তাদের মনের ভারসাম্য যদি চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসা অর্ধসত্য, গুজব, বিদ্বেষের হলকা বিচলিত করে ফেলে— চূড়ান্ত দুঃসময়ের পর্বে কে কাকে দায়ী করবে। একই ব্যাপার ঘটেছে পূর্ববঙ্গের বহু প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর দাঙ্গাবাজদের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসে। আবার লিখি, এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। ইতিহাসকে তো পালটানো যায় না; তবে ইতিহাসের মানবিক পুনর্ভাষ্য রচনার চেষ্টা করা যায় নিশ্চয়। এমনকি, ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ কিছু প্রশ্ন নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য বিকল্পের প্রতি ইশারা করা যায়। এই জরুরি কৃত্যটুকু 'আগুনপাখি'-র মধ্যে করেছেন বরেণ্য কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক। সাহিত্যের স্বশাসন ও স্বয়ম্ভবতায় যেহেতু তাঁর বিশ্বাস অস্খলিত, জীবনের পক্ষে বারবার তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই আত্মিক ব্যাধি, ইতিহাসের ব্যাধি উপশমের বিশল্যকরণী আখ্যানের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছেন। যত বড় বিপর্যয়ই হোক, জীবন থেকেই ওষধি সংগ্রহ করে নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হয় নিজস্ব অবিচল বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পক্ষে যেমন করেছে আখ্যানের ওই স্বশিক্ষিতা গ্রামীণ নারী, শৌর্যে ও আত্মপ্রত্যয়ে যে অদ্বিতীয়া। ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি যে উপসংহারে তার কণ্ঠস্বর যেন মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তিতে তেজোময়। অনুকূল হাওয়ায় তো সবাই নৌকোয় পাল তুলে দিতে পারে। কিন্তু সমস্তই যখন প্রতিকূল, সঙ্গে নেই কেউ, তখন ক'জন নিজেকে বোঝাতে পারে 'একলা চলো রে।' ওই নারী পেরেছে। চারদিক যখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা, পরিবারে ও সমাজে কোথাও কোনো আশা নেই— মাথা উঁচু করেই সে দাঁড়িয়েছে আর নিজেকে বলেছে অপূর্ব কাব্যিক ও দার্শনিক ভাষায় :

> সকাল হোক, আলো ফুটুক, তখন পুবদিকে মুখ করে বসব। সুরুজের আলোর দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়াব আমি। আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতে পারব আমি। একা।

অবিস্মরণীয় এই বাচনে সে হয়ে উঠছে অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। এমন আলো যে আসলে আলোর রাখাল হয়ে অন্যদের মধ্যেও আলো সঞ্চারিত করতে চায়। বহুস্বরিক স্বপ্ন কথনের বার্তা পাচ্ছি এখানে। বুঝতে পারছি, রাতের সবচেয়ে অন্ধকার প্রহরই ভোরের পূর্বযাম। সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে এই যে উঠে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি, তা নিছক একক স্বর নয় সামূহিক উত্থানের কথাবার্তা। কী দারুণ আত্মপ্রত্যয়ে সবাইকে বুকে টেনে নেওয়ার কথা ভাবতে পারে ওই নারী। অথচ তখন সে স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন। তাহলে, এই 'সবাই'-এর মধ্যে আরও কিছু ইশারা রয়েছে যাকে ভাবতে পারি আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। কেননা বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া তো তখনই পাওয়া যায়। আর, সবশেষে 'একা' শব্দটির একক ব্যবহারে কিন্তু নিঃসঙ্গতা নেই, বিচ্ছিন্নতা নেই। বরং তা যেন সামূহিক অর্থাৎ 'আমরা'। ঠিক 'বনলতা সেন'-এর প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তির মতো : 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' এমন অনেকার্থদ্যোতক সমাপ্তিহীন উপসংহার বাংলা আখ্যানে খুব বেশি পাইনি।

এখানে আরেকবার হাসানের নিবন্ধের কাছেই ফিরে যাচ্ছি। 'ছড়ানো ছিটানো' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'জীবনের পক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> শিল্প এবং শিল্পের কাজ একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবতীয় ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সমাজের ভয়াবহ পরিস্থিতির নিষ্ঠুর ব্যবচ্ছেদ করতে ও তা ঠিক ঠিক বাস্তবতাটা দেখিয়ে দিতে পারে। মানবিক পরিস্থিতির ছবি, অপচয়ের ছবি সাহিত্যই তুলে আনতে পারে। নিজেকে নিজের পচন

> আর ক্ষতের মুখোমুখি করে দিতে পারে। রাজনীতি যখন নতুন সমাজের কথা বলে, তখন বিদ্যমান সমাজ কতদূর কি করতে পারে তা বোঝাতে বোঝাতে সমাজ বদলের দায় একসময়ে শ্লোগান হিসেবে নয়, অপরিহার্য হিসেবেই দেখা দিতে পারে। একটা সমাজ কতটা মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়েছে, কতটা মানবতাবিরোধী হয়ে গেছে কিংবা তার জাগতিক আত্মিক সম্পদ কতটা শূন্য হয়ে গেছে— এটাই যখন আমরা সাহিত্যে তুলে ধরি তখন সে-সাহিত্য খুব উঁচু মানের সাহিত্য হতেই পারে। (২০০৮:৬৫-৬৬)

এই নিরিখেই 'আগুনপাখি' অনন্য সাহিত্যকৃতি। ১৯৪৭ সালে সামূহিক অন্ধতা যখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল, চর্যাপদ থেকে প্রবহমাণ সাংস্কৃতিক ধারার অবিভাজ্যতা যখন আঁধিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল— আত্মহননের মাদকে বাঙালি তার মেধা ও হৃদয় সমর্পণ করেছিল। বাংলার সমস্ত বসতি যেন বিরাট রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল যেখানে প্রত্যেকেই কাঠের পুতুলের মতো নিরেট নিস্তব্ধ বসে থেকে নির্বিকার দেখে যাচ্ছিল মহাসর্বনাশের পালা কীভাবে অভিনীত হচ্ছে। প্রত্যেকেই পাথরের মতো নিষ্ক্রিয় ছিল; শুধু মাঝে-মাঝে নিজেদের দুভাগে বিন্যস্ত করে কখনও কৌরবের আর কখনও পাণ্ডবের জয়োল্লাসে ফেটে পড়ছিল। প্রায় দুশো বছর আগে ১৭৫৭ সালেও বাঙালি এমনই অ্যাম্পিথিয়েটারের নিরপেক্ষ দর্শকে পরিণত হয়েছিল যখন ক্লাইভের কয়েকশো সেনা কুচকাওয়াজ করে ইতিহাসের দখল নিতে এগিয়ে যাচ্ছিল আর কাতারে-কাতারে বাঙালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল শুধু। সত্যিই বাংলার গল্প ভাগাড়েরই গল্প— তা সে পলাশির যুদ্ধই হোক আর দেশভাগই হোক। চারদিক থেকে কাক-চিল-শকুন ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে এসে একে অন্যের মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে অঘোর বাস্তব তৈরি করে। তাই হাসান আজিজুল হকের মতো স্রষ্টাকে বাস্তবাতিযায়ী কল্পনা দিয়ে নির্মাণ করে নিতে হয় আগুনপাখি এক আশ্চর্য নারীকে যে আমাদের অন্ধতা, কাপুরুষতা, মেরুদণ্ডহীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে উচ্চতর সম্ভাব্য বাস্তবের নকিব হয়ে ওঠে।

কল্পনা-রঞ্জিত এই উচ্চতর বাস্তব কিন্তু চিরকালের। দেশভাগের মতো মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিও গভীরতা সম্পন্ন ঘটনা যদিও অতীত, আরও বহু বহুদিন তা অলক্ষ্যে আমাদের বর্তমানকে প্রভাবিত করতে থাকবে। বার্তা বয়ে আনবে আত্মশোধনের। ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের পাঠ দিতে থাকবে সামূহিক জীবনে ব্যক্তি-জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে। এই প্রতিবেদনে ভাবছি আখ্যানে এক নারীর উদ্দীপক অবস্থান নিয়ে, যে আপাতদৃষ্টিতে সব কিছু হারিয়েও সর্বজয়া। হাসান স্পষ্টত উপন্যাসের প্রচলিত সংরূপ থেকে উচ্চতর আখ্যানের স্তরে তাঁর অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের দ্বিরালাপিক সংহতি প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত চেক কথাকার মিলান কুন্দেরা 'The Art of the Novel' বইতে যে-মন্তব্য করেছেন, তা যদিও প্রণিধানযোগ্য, ইউরোপীয় ইতিহাস ও বাস্তব আর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও বাস্তব (বিশেষত বাংলার) তুল্যমূল্য নয়

> 'The novel's spirit is the spirit of continuity, each work is an answer to preceding ones, each work contains all the previous experience of the novel, But the spirit of our time is firmly focused on a present that is so expansive and profuse that it shoves the past off our horizon and reduces time to the present moment only. Within this system the novel is no longer a work (a thing made to last, to connect the past with the future) but one current event among many, a gesture with no tomorrow.' (১৯৯৯ : ১৮-১৯)

ছয়

ইউরোপীয় বিশেষভাবে আধুনিকতাবাদী, বিশ্ববীক্ষায় তাঁদের উপন্যাস শুধুই বর্তমানজীবী হতে পারে। সব জিনিসকে টুকরো করে আনা যাদের মান্য পদ্ধতি, তাদের ধারণায় খণ্ডকাল কখনো অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতু তৈরি করতে পারে না। মহাকাল তাদের কাছে অস্তিত্বহীন বলে বর্তমানকে ওরা এতদূর প্রসারিত করতে পারে যে অতীতকে দিগন্তরেখার বাইরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। ফলে উপন্যাসে সাম্প্রতিক ইউরোপীয় বিবেচনায়, নেই কোনো আগামীকাল অর্থাৎ তা এলিয়টীয় গতিহীন ইঙ্গিত (gesture without motion)। কিন্তু উত্তরায়ণ-প্রবণ বঙ্গীয় মনীষায় ও উপলব্ধিতে বর্তমানই সবকিছু নয়, তা পরম্পরায় খচিত অর্থাৎ একদিকে সে ধরে রাখে অতীতকে এবং অন্যদিকে ভবিষ্যৎকে। বিস্তীর্ণ এই চলিষ্ণুতার মহাপটভূমিকে চমৎকার বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ। অনেকদূর অবধি তারাশঙ্করও। আর বুঝেছেন 'আগুনপাখি'-র স্রষ্টা হাসান আজিজুল হক। দেশভাগ ও প্রব্রজনের মহাকাব্যিক আখ্যান তাই তাঁর দার্শনিক বোধে নিছক 'One current event among many' নয়।

এই জন্যে যে সমাপ্তিবিহীন উপসংহারের নিরিখে এই আখ্যানের কথক, তার মনোভূমি এবং তার উচ্চারণের সামাজিক ও দার্শনিক তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছি— তার ক্রমিক নির্মাণ-পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ থেকেই স্পষ্ট হয়, কেন তা বিন্দুতুল্য বর্তমান নয়। কথকসত্তার ওই চূড়ান্ত হয়ে ওঠা তো শিল্পিত নির্মাণ-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। কথকতার পরম্পরা থেকে সূত্র নিয়ে হাসান প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলাদা শিরোনাম দিয়েছেন; ভাই কাঁকালে পুঁটুলি হল, বিছেনা ছেড়ে একদিন আর উঠলে না, আমার বিয়ের ফুল ফুটল, মাটির রাজবাড়িতে আমার আদর, বড় সোংসারে থই মেলে না, আমার একটি খোঁকা হলো, সোয়ামি সোংসার নিয়ে আমার খুব গবব হলো, সোংসার সুখ-দুখের দুই সুতোয় বোনা বই-তো লয়,... ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পৌঁছলাম সোংসার তাসের ঘর, তুমি রাখতে চাইলেও বা কি-তে। যেন ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের স্থায়ী অন্তরা-সঞ্চারী। স্থায়ী ও অন্তরায় সুর বিস্তার যেন ঘটল বিলম্বিত লয়ে। কিন্তু তার পরই এল দ্রুত লয়ের দ্রুততর হয়ে ওঠা, 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, সবাই পেথগন্ন হলো' থেকে এলাম 'এত খুন, এত লউ, মানুষ মানুষের কাছে আসছে খুন করার লেগে'-র পর্যায়ে। এর পরই এল অন্তিম পর্যায়, যা আখ্যানেরও শীর্ষবিন্দু 'আর কেউ নাই, এইবার আমি একা।' এ যেন রুদ্র বীণার ঝংকার যা সমে এসে পৌঁছল। লাতিন ভাষার বিখ্যাত প্রবচন অনুযায়ী 'Consummatum est' কিংবা হ্যামলেটের ট্র্যাজিক সংরাগে সময়-কথার নৈঃশব্দ্যে মিশে যাওয়া 'The rest is silence'। হাসানের অসামান্য কৃতিত্ব এখানেই যে দেশভাগের সর্বজনীন আত্মহননের কাহিনিকে তিনি একই সঙ্গে এক গ্রামীণ নারীর আত্মপ্রত্যয়ে স্থিতধী হয়ে ওঠার ব্যক্তিগত কথায় সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত নারীচেতনাবাদী অধ্যয়নের পক্ষেও 'আগুনপাখি' অসামান্য এক পাঠকৃতি। তা হয়তো ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে পথভ্রান্ত বাঙালির অসুখের আখ্যান; আসলে তার চেয়েও বেশি নিরাময় কথা। উপশমের সম্ভাবনা আভাসে রয়েছে যেহেতু এতটুকুই আখ্যানকারের সীমা। এ হল সেই আগুনপাখির বৃত্তান্ত যে সারাটা জীবন ধরে সবার অগোচরে আগুন খেয়েছে এবং তার ভেতরটা অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত সে নিজেও তার হদিশ পায়নি। কিন্তু যখন তার নিঃশব্দ হয়ে ওঠার পরিণতিতে সংঘবদ্ধ মূঢ়তা ও মিথ্যার আস্ফালন থেকে সত্যকে বেছে নেওয়ার সময় এল, আগুনপাখি উগরে দিল আগুন। সেই আগুনে ঝলসে গেল তার এতদিনকার অভ্যস্ত সংসার। সমাজ বলেও কিছু রইল না; সে একা রইল তার নিজের জন্যে, পরিবারও থাকল না। এই নারী সারা জীবন ধরেই শুধু দেখেছে প্রতিকারহীন বিচ্ছেদ আর ব্যাখ্যাতীত অনন্বয়। বাপের বাড়িতে 'উঁচু-উসারা-অয়লাদখিন-দুয়োরি ঘরটো' ফাঁকা করে এক বাদলের রাত-দোপরে তার মায়ের জান গেল। তার বাপ ফের বিয়ে করল, আদরের 'দাদি চলে গেল যেন

দুনিয়ার সব গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে গেল', তার কাঁকাল থেকে ছোট ভাইকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল মামুরা। তখন 'মেয়েদের তো রাঁধাবাড়া আর ছেলে মানুষ করা ছাড়া আর কুনো কাজ ছিল না।' 'মেয়ে বাপের আঘিন্নে দায়' বলে তারও বিয়ে হল সম্পন্ন ঘরে। স্বামী তাকে 'সারা জেবন' হেনস্তা করেছে, 'কতো কুবাক্যি বলেছে', কেননা পিতৃতন্ত্রে এটাই বিধি। আর, এই প্রেক্ষিতে তার আগুনপাখি হয়ে ওঠাও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা তার মনে এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল—

> সেই যি ঘানি টানতে লাগলম, সারা জেবন একবারও আর থামতে পারলম না। ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। শুধুই হুকুম তামিল করা। এ্যাকন মনে হয়, জেবনের কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ না মানুষের ছেঁয়া? তা-ও কি আমার নিজের ছেঁয়া?

অবশ্য স্বামীর আগ্রহে এই নারী একটু-একটু করে লিখতে-পড়তে শিখল। বঙ্গবাসী পত্রিকাও। আঁধার থেকে আলোর দিকে তার এই যাত্রা কিন্তু ঘটল নিঃশব্দে, অনেকখানি হয়তো তার নিজেরও অগোচরে। তখনই সে জানতে পারল দেশের পরাধীনতার কথা। সুখ-দুঃখের ঘন বুনটের মধ্য দিয়েই এসে গেল মহাদুর্বিপাকের ক্রান্তিকাল— হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ববিরোধ ক্রমশ ঘূর্ণিবাত্যার চেহারা নিল। বড় পরিসর যখন আবর্ত-সঙ্কুল, ছোট পরিসরও সংশয়ে-অবিশ্বাসে আবিল হয়ে উঠল। ইতিহাসের বড় সুতো যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা, দেশভাগের প্রস্তুতি ইত্যাদি, ছোট সুতোর বয়নে তবে আগুনপাখির সাংসারিক ভাঙচুর। তবু সেই চরম আত্মবিস্মৃতির পর্বে শুধু সেই নারীই বুঝেছিল, 'দাঙ্গা তো জেবনের লিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের লিয়ম।' আখ্যানে যা-ই ঘটে থাকুক, এই সত্যোপলব্ধির উদ্‌ভাসনই পাঠকের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

প্রবাহিত মনুষ্যত্বকে অব্যাহত রাখার যুদ্ধকথাই আগুনপাখি। হাসান আমাদের কাছে আখ্যানের বিশাল বড় মাপ তৈরি করে দিয়েছেন। নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলা কথাসাহিত্যের মাপটা খুব বড় নয়। ব্যক্তিগতকে সামাজিক সত্যে উত্তীর্ণ করার প্রস্তাবে সায় দিই কিন্তু কীভাবে তা করা যাবে, এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা খুব একটা নেই। তাই দেশভাগ-প্রব্রজন-বাঙালি জাতির মহাবিপর্যয়ের মতো মহাবিষয়কেও প্রতীক্ষা করতে হয় হাসান আজিজুল হক আর তাঁর আগুনপাখির জন্যে।

ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণ

মিতা চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের দুই পথিকৃৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে উভয়ের মধ্যে একটি সমধর্মিতা লক্ষ করা যায়; তা হল উভয়ই ইন্দ্রিয়সচেতন। বিশেষত প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সুধা তাঁরা উভয়েই প্রাণ ভরে গ্রহণ করেছেন। সিদ্ধহস্তে বর্ণনা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। বর্ণনার ধরনটি অবশ্যই তাঁদের নিজস্ব ছিল। কিন্তু শিল্পী হতে গেলে ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে কল্পনাকে নিয়ে যাওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> শিল্পই বলো আর যাই বলো কোনো কিছুতে কুশল হয় না চোখ হাত কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে...
>
> জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে তো মিলতে পারে না, যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এই জন্যেই কবিতা, সংগীত, ছবি এসবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ কানের সাধারণ দেখাশোনার চালচলনের বিপর্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। [১]

এমন ইন্দ্রিয় বিপর্যয় যখন ঘটে তখনই দ্রষ্টা স্রষ্টা হয়ে ওঠেন এমনও বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ সে ধরনের স্রষ্টা। ইন্দ্রিয়সংবেদ্য যা কিছু তাকে তো তাঁরা ভাষায়ই প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো রূপ বা অবস্থা যা ইন্দ্রিয়ের তারে বাঁধা পড়ে না সেখানে বিভূতিভূষণ স্বীকার করেছেন ভাষার সীমাবদ্ধতা। জীবনানন্দের রচনায়ও ভাষা হয়ে উঠেছে অনির্বচনীয়।

'পথের পাঁচালী'-র প্রকৃতিমুগ্ধ অপু একটু একটু করে বড় হয়ে উঠেছে। তার চিন্তা ভাবনার পরিসরও গভীর এবং প্রসারিত হয়। 'অপরাজিত'তে এসে একসময় তার মনে হয়েছে—

চক্রবর্তী, মিতা : *ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণ*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ২৩-৩৩

> এই জগতের পিছনের আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রার ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা— পিঁয়াজের খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা, তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথায় যেন ঢাকা আছে। কোন জীবন-পারের মরণ পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।[২]

জঙ্গলমহলে চাকরিরত সত্যচরণ ধীরে ধীরে অরণ্যপ্রকৃতির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। কারণ সেই অরণ্যভূমিতেও সে অসীমতার স্পর্শ লাভ করেছিল। তার মনে হয়েছিল 'এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর' ছেড়ে বা এর 'রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ' ছেড়ে কলকাতার কোলাহলে সে আর কোনোদিন ফিরতে পারবে না। ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্না-রাত্রির একটি বর্ণনা এরকম—

> ... ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখাপড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না— করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্তবিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।[৩]

আর একদিনের অনুভূতি এরকম—

> জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতি এইরূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত— নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্না-রাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তালে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।[৪]

এই অসীমতা লেখকের মনে অধ্যাত্মচিন্তা বয়ে আনে। যাকে সম্পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ব্যক্তিজীবনে বাল্যবয়স থেকে পিতার সান্নিধ্যে এই ধরনের চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তা ক্রমে গাঢ়তর হয়েছে। অরণ্যের সৌন্দর্যের মধ্যেও তাই তাঁর ঈশ্বরচিন্তা দেখা যায়।

> যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আর্বিভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত— জন্ম জন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে— সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়।[৫]

অনন্ত পথযাত্রী এই লেখক জীবনের শেষেও একটা জগৎ সম্বন্ধে ভাবতেন। তাঁর দিনলিপিতেও এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে?...

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব জ্যোৎস্না-রাত্রির এই নির্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণভরে ভালবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্না ভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম— কালীধরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্যবার্তার মত একটা বড় নক্ষত্র মনে যে নিয়ে আসে। কি সব চিন্তা আনে? কি মাধুর্য ... মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে।...[৬]

আবার লিখেছেন—

কতদিন ব'সে ব'সে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশ আছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারণ কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবন পথে দুশো তিনশো বছরের স্মৃতি ঐশ্বর্য কি, তা ভাবলেও পলকে শিউরে উঠতে হয়— হাজার বছরের? দুই হাজার বছরের? বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের।[৭]

তাঁর রচনায়ও তিনি নিয়ে এসেছেন সেই অনুভূতি। সংসারী অথচ সন্ন্যাসী ভবানী বাঁড়ুয্যের অনুভূতির প্রকাশ এভাবে—

স্তব্ধ, নীল শূন্য যে অজ্ঞাত জীবন, তারই বার্তা যেন এই সুন্দর, নির্জন সন্ধ্যাটিতে ভেসে আসছে।[৮]

'তৃণাঙ্কুর'-এ সেই 'অজানা দেশ'-এর রূপ সম্বন্ধে লেখককে আবার চিন্তামগ্ন দেখা যায়।

... আমি যেন এই জগতের কেউ নই— আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগত থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেছি ... তার কারণ আমার গতি স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এই মাত্র যেন ইচ্ছা মত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট-মিট করে জ্বলচে— ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মত কোন এক জগতে অপরূপের বিবর্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাব কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে।[৯]

তিনি সেই মহৎ বিরাট শিল্পস্রষ্টার সৃষ্টিতে আশ্চর্য বোধ করেছেন। সেই 'অতলস্পর্শ, মহিমময় রহস্য'কে তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। সেই 'নিঃসীম শূন্য' তিনি একটি কল্পলোকের সৃষ্টি করেছেন— 'দেবযান' যার নাম। যে চিন্তার কথা তিনি 'তৃণাঙ্কুর'-এ লিখেছেন—

... মনে হলো আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়। আমি জন্মজন্মান্তরের পথিক-আত্মা।[১০]

'দেবযান'-এ যতীন ঠিক এমনিভাবেই ভেবেছিল—

...শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়— সে উচ্চ অমৃত্বের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েছে, সে মুক্ত, সে বিরাট— তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে যায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপী তাপী, মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেছে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেছে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে— সে নৃত্যশীল গ্রহ-নক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যছন্দে লীলাময়,

পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। একি আনন্দ। একি শিল্পমাধুর্য! একি অভিনব অননুভূতপূর্ব অমরতা।[১১]

বাস্তব জগতের ওপারের বর্ণনায় তিনি আরও বলেন—

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছল, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেকখানিই বর্ণনা করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহুগুণে বর্ধিত সুখ দুঃখের অনুভূতির স্পন্দমান তীব্রতার।[১২]

মন ও বুদ্ধির অগোচর সে স্থান। ইন্দ্রিয়বোধাতীত সে স্থান। আত্মা এমনই এক অবাঙ্‌মনসগোচর স্থানের অধিবাসী। 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর জিতু সেই অনুভূতি জগতের অধিবাসী। জিতুরা যখন জেঠিমাদের আশ্রিত তখনকার একটি দিনের অনুভূতির প্রকাশ এরকম—

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে আরতি শুরু হয়েছে,... এমন সময় আমার মনে হ'ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহু পরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা— চা বাগানে এরকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়— সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না,...[১৩]

এক ধরনের অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী সে। অদৃশ্যকে দেখবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা তার। মেজবাবু তার মনিব হতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষমতা মেজবাবুর নেই।

মনের ধর্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেছি নিজের জীবনে— মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিসকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের।[১৪]

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে যে বোধ, জিতু তারই অধিকারী।

মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে...সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি,...আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে...এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, একটা গৌরব সমৃদ্ধ পবিত্র নবজন্ম।[১৫]

'তৃণাঙ্কুর'-এ এই অনুভূতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলছেন—

...জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাঁধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।[১৬]

এ ধরনের চিন্তাই বিভূতিভূষণকে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী করে তোলে।

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্চে, হয়তো দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে,...তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্য এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি—তিনি এক বড় শিল্পী।[১৭]

বিভূতিভূষণের মনে প্রকৃতির নির্মলতা, শুদ্ধতা, প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি ছিল একথা

সর্বজনবিদিত। তাঁর সৌন্দর্য-রূপের অনুধ্যান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আত্মনিবেদন নিসর্গের বিবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হত। এই ভাবটিকে ভাষায় রূপ দেবার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ।

জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রিয়সচেতন কবি হিসেবেই খ্যাত। 'পরিচয়' (বৈশাখ ১৩৪৪)-এ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য জীবনানন্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বিষয়ে লিখেছেন—

> জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য শব্দ স্পর্শ রং রূপ গন্ধের অনুভূতিমুখর বাণী। এগুলি ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি নয়— তিনি কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুভূতিমুখর।[১৮]

জীবনানন্দের ভাষা অতুলনীয়। তিনি জানতেন ভাষা 'সামাজিক পরিস্থিতির সূক্ষ্ম ও স্থূল পরিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে'[১৯] জড়িত। প্রথাগত ভাষাকে ব্যবহার না করেই তিনি বাংলা ভাষায় লিখে গেছেন—

> তিনি পেয়েছেন সেই বিন্দু যেখানে প্রকাশগম্য ও প্রকাশাতীতের কিংবা বস্তুগত ও ভাবগত বৈপরীত্যের অবসানে ভাষার সৃষ্টি হয় নতুন প্রকাশভঙ্গি। ফলে ভাষায় থাকে না সেই অভ্যস্ত রৈখিকতা, ব্যাকরণের ক্রম স্বীকৃত হয় না, পদ ও বাক্যের পরিচিত পরম্পরা বিপর্যস্ত হয়ে যায়।[২০]

আসলে জীবনানন্দ জানতেন—

> প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্টি হয়।[২১]

ফলে তিনি প্রতিটি শব্দকে নতুন করে সৃষ্টি করলেন। রচনাকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তা জরুরি ছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন বলেছিলেন—

> শব্দের স্বভাব টাকার মতো; বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জন্মে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাস কেসে।... অপ্রচলিত শব্দও অবস্থা বিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন ক'মে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে।
>
> অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাধ সাধে না।[২২]

'ঝরাপালক'-এর যুগে ভাষা তার স্বাভাবিক শাসনে বদ্ধ ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব ধরনে শব্দকুশলী হয়ে উঠলেন। কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া যাক—

সেই জলমেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,— শাদা,— বরফের কুচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল! (পরস্পর, ধূ. পা.)

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!...
ইঁদুরেরা চলে গেছে— আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চারা,
(অবসরের গান, ধূ.পা.)

আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে,
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রানে—আস্বাদে! (ক্যাম্পে, ধূ.পা.)

চোখে ঠোঁটে অসুবিধা-ভিতরে অসুখ! (পরস্পর, ধূ. পা.)

এ দেহ—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ!
চুমে লয়, রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালীর পালে
উঠানে...
আঙুলের নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছেড়ে
অন্য ক্ষেতে (পিপাসার গান, ধূ, পা,)

সেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন— (শকুন, ধূ. পা.)

'মৃত্যুর আগে' কবিতায় কিছু চরণ 'নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার' 'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে', 'নরম জলের গন্ধ', 'নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে'—শব্দের ব্যবহার এখানে আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে গেছে। এই কবিতায়ই কবি লিখেছিলেন—

আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে :...
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির।

চোখে দেখার জগতের ওপারের জগৎকে স্পর্শ বা প্রকাশ করার জন্যই কবির ভাষা পালটাতে শুরু করল।

এই কাব্যের কাছাকাছি সময়ে 'রূপসী বাংলা' পর্যায়ে কবির ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে এক জাদুকরি মায়া। কবি গোপনে ভ্রমণ করেন দূর অতীতে। ভাষা তার উপযোগী। "তাঁর 'রূপসী বাংলা', যাকে পারি বলতে বাংলার স্তব, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবহমান বাংলার প্রাণধ্বনি..." [২৩]

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
...সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে

সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা— ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ

আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
...অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত

রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে

রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে স্বপনের

...তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি-শান্তি লেগে রয় :
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ-শাদা হাত যেন স্তন—ঘাস—।
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।
সাদা পথ-সোঁদা পথ-বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে— শ্মশানের পারে বুঝি;

১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সালের সময়কালে লিখিত যে কবিতাগুলি '১৯৮৬ সাল পর্যন্ত নানা পত্রপত্রিকায় ও সংকলন পত্রে ছাপা'[২৪] হয়েছিল সেই কবিতাগুলিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে শব্দের নানা বিচ্ছুরণ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ'-এ 'অন্যান্য কবিতা' নামক সংকলনে তা প্রকাশিত হয়েছে।

অনন্ত নৃত্যের লোভে, অফুরন্ত উল্লাসের তৃষা
(বেদুঈন : অন্যান্য কবিতা)

চারদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বংস
কেবলই পড়িতে আছে; সংগীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট করে দিয়ে যায়;...
...আলো জ্বলে শকুনিমামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।
(আমিষাশী তরবার, অন্যান্য কবিতা)

উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
করে নিতে গেল—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়
(ঘাস, অ. ক.)

সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সুর্যের পাকস্থলীর। (কোরাস, অ. ক.)
লবণসমুদ্র তাকে যেমন উজ্জ্বল করে—সূট যা সব

রৌদ্র দিয়ে সৃষ্টি করে—”

(অনুভব, অ. ক.)

‘বনলতা সেন’ পর্যায়ে এসে জীবনানন্দ দেখলেন ‘মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি’। ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ’-এর খবর জানতে পারলেন। কিন্তু অসুস্থতাই শেষ কথা নয়, রয়েছে স্বপ্ন ও সময়। দেখেছেন ‘ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুখে ফেলে চিল’। শব্দপ্রয়োগে নিয়ে এলেন আরও সূক্ষ্মতা। ‘অন্ধকার’কে বিভিন্ন রূপে উজ্জ্বল করে সৃষ্টি করলেন— ‘নিশীথের অন্ধকার’, ‘দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে’ ‘অন্ধকার বিদিশার নিশা’, ‘তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে’, ‘থাকে শুধু অন্ধকার’। প্রচলিত শব্দ ব্যবহারই কেমন করে যেন তাঁর হাতে নতুন হয়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ—

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি আমি। আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে

(কমলালেবু, ব. সে.)

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে...
ম্রিয়মান আঁচলে সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্‌বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর। (দুজন, ব. সে.)

তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী,
রেশম, মদের সার্থবাহ
দুধের মতন শাদা নারী।
অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে

(সবিতা, ব.সে.)

— কুয়াশার পাখনার—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে সে আলোক
জোনাকির দেহ হতে— খুঁজেছি তোমারে সেইখানে
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে, আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।
দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা (শঙ্খমালা, ব. সে.)

বাস্তবের ছবি কবি এমনিভাবে এক নিঃশব্দের জগতে গিয়ে যেতে পারেন। শঙ্খ ঘোষ যেভাবে বলেন—

কেবল চোখে দেখা বিশ্ব নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রক্ষেপণকে একসঙ্গে টান দিয়ে ধরতে হয় তাঁর, সেই টান যদি জেগে ওঠে রচনার মধ্যে তাহলেই তাকে বলি সৃষ্টি, বলি প্রতিভা।[২৫]

জীবনানন্দের কলমে ভাষা পুনর্জন্ম লাভ করে। 'মহাপৃথিবী' সংকলনে তাঁর ভাষা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বাইরের পৃথিবী যখন মুখোশে ঢেকে নিয়েছে তার মুখ, কবি তখন ধারালো হাতে খুলে নেন সেই নির্মোক।

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে— ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-হয়ে
ব্যবহৃত-ব্যবহৃত...
ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায়?

(আদিম দেবতারা, মহাপৃথিবী)

উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

(আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী)

সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায়; ...
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এই খানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন ঃ নীল লাল রূপালি নীরব।

(শব, মহাপৃথিবী)

এই পর্যায়ে এসে কবি তাঁর হৃদয়ে 'সুপক্ক রাত্রির গন্ধ' অনুভব করেন। যন্ত্রণার এই পৃথিবী থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে 'মালাবার ফেনার সন্তান' সিন্ধুসারস পাখি। সে এসেছে সেখান থেকেই যেখানে 'পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান'। কিন্তু উড়ে যাচ্ছে 'শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়'। তবু সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই কোনো। কবি তাই দেখেন 'বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে'।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে যখন কবির সময়চেতনা তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন কবির ভাষাও তার অনুগামী— শাণিত। যেখানে 'কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়'। আর কবি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা রূপে তার রূপ আঁকেন কবিতায়।

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনোমোর'পরে।
...চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো— ঘুমে-ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ওপাশের পাইস্ রেস্তরাঁতে;

(ঘোড়া : সাতটি তারার তিমির)

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী—

একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মণীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।

(কবিতা, সা. তা. তি.)

শব্দ কীভাবে নিঃশব্দকে বুঝিয়ে দিতে পারে, জীবনানন্দ তারই প্রমাণ দিলেন—

ও প্রাসাদে কারা থাকে?— কেউ নেই— সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে— জ্বলিতেছে— মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্বলে যায়— দহে নাকো কিছু।

(একটি কবিতা, সা. তা. তি.)

মহাসাগরের জল কখনও কি সংবিজ্ঞতার মতো হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নীচে?

(ক্ষেতে প্রান্তরে, সা. তা. তি.)

লক্ষণীয় যে এখন থেকে তাঁর প্রকাশের ভাষার মধ্যে এসে গেছে তৎসম শব্দ। ভাষা যেন নতুন করে সৃষ্টি হয়ে উঠল। এই সময়ের কিছু শব্দবন্ধের উদাহরণ— 'তাজা ন্যাকড়ার ফালি', 'সোনালি হেঁয়ালি', 'শাদা চাদরের মতো-জনহীন-বাতাসের ধ্বনি', 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', 'স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে', 'কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে', 'সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওংকার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়'— ইত্যাদি শব্দ যেন এক রহস্যময় জগতের ছবি নিয়ে আসে।

'বেলা অবেলা কালবেলা' সংকলনেও দেখি শব্দ তার পরিচিত অর্থ ছেড়ে অনুভবের জগতে সাড়া জাগায়।

প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।

(তোমাকে, বেলা অবেলা কালবেলা)

চারদিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ-সব
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।...
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবু তোমার গভীর এরিয়েলে।

(গভীর এরিয়েল, বে. অ. কা.)

মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর স্মরণীয় উক্তি—

> তাঁর কাব্যে গদ্য-ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ করে গেছে।[২৬]

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ; বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ; দৃষ্টি ও সৃষ্টি ; প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯ ; পৃঃ ১৯
২. বিভূতিভূষণ রচনাবলী ; ২য় খণ্ড ; অপরাজিত ; ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ; জন্মশতবর্ষ ; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ; পৃ. ২৪২
৩. বি. র. ; ৫ম খণ্ড; আরণ্যক ; পৃ. ১৫
৪. বি. র. ; প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫৯

৫. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১০১
৬. বি. র. ; ৩য় খণ্ড ; স্মৃতির রেখা ; পৃ. ২৪৬
৭. প্রাগুক্ত ; পৃ. ২৪৭
৮. প্রাগুক্ত ; ৯ম খণ্ড; ইছামতী; পৃ. ১৫৩
৯. বি. র. ; ৪র্থ খণ্ড ; তৃণাঙ্কুর ; পৃ. ২২৮
১০. প্রাগুক্ত ; পৃ. ২৩৬
১১. বি. র. ; ৬ষ্ঠ খণ্ড; দেবযান ; পৃ. ৩১
১২. প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪২
১৩. বি. র. ; ৩য় খণ্ড ; দৃষ্টিপ্রদীপ ; পৃ. ৩১
১৪. প্রাগুক্ত ; পৃ. ৭৪
১৫. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১১৮
১৬. বি. র. ; ৪র্থ খণ্ড ; তৃণাঙ্কুর ; পৃ. ২২০
১৭. প্রাগুক্ত ; পৃ. ২৩৬
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ ; জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ; দ্বিতীয় সংস্করণ : মে, ১৯৭৯ ; ভারত বুক এজেন্সি ; পৃয় ১০৭
১৯. ভট্টাচার্য তপোধীর, ভট্টাচার্য স্বপ্না ; আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব ; জীবনানন্দের কাব্যভাষা : প্রস্তুতিপর্ব ; নবার্ক ; প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৩, জানুয়ারি ১৯৮৭ ; পৃ. ১১২
২০. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১১০
২১. দাশ, জীবনানন্দ; কবিতার কথা ; রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ২০
২২. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ ; 'স্বগত'; 'কাব্যের মুক্তি' ; জুন ২০০০, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ ; দেজ পাবলিশিং ; ২৪
২৩. পত্রী, পূর্ণেন্দু ; রূপসী বাংলার দুই কবি ; প্রথম সংস্করণ ; নভেম্বর ১৯৮০ ; আনন্দ পাবলিশার্স ; পৃ. ১৫৩
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ : জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ ; ভারবি ; আশ্বিন ১৪০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ; ভূমিকা ; অন্যান্য কবিতা।
২৫. ঘোষ, শঙ্খ ; শব্দ আর সত্য ; ১৩৮৮ চৈত্র ১ ; ১৫ মার্চ ১৯৮২ ; প্যাপিরাস ; পৃ. ৭২
২৬. বসু, বুদ্ধদেব : প্রবন্ধ সংকলন ; জীবনানন্দ দাশের স্মরণে ; প্রথম দে'জ সংস্করণ : মাঘ ১৩৮৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ; পৃ. ১১৯

‘টপ্পা ঠুংরি’র বিষ্ণু দে

শিপ্রা গুহ নিয়োগী

কবি বিষ্ণু দে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাংলা কবিতার দীর্ঘ পদযাত্রায় তিনি একটি বিশেষ নাম। রাজনৈতিক দর্শনের উপলব্ধিকে তিনি আজীবন গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতেন যে এতেই শিল্প বা জীবনের মুক্তি। তিনি কালসচেতন কবি ছিলেন। সারা ভারতবর্ষব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম, চল্লিশের দশকের উত্তাল ঘটনাসমূহ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, বাংলাদেশের পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি নানা ঘটনায় স্পন্দিত তাঁর কবিতা। জীবনঘনিষ্ঠ চেতনার রূপায়ণে বিষ্ণু দে অগ্রগণ্য। লোকায়ত ঐতিহ্য, পুরাণ প্রতিমা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব, মার্কসীয় দর্শন, মানবিক প্রেম, শ্রেণিহীন সমাজাকাঙ্ক্ষা, কলোনির মধ্যবিত্ত জীবন ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর কাব্যজগৎ।

বিষ্ণু দে-র কাব্যজগতে তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হল নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতা, দ্বিতীয় স্তর নিঃসঙ্গতার অন্বেষণে সমাজজীবন ও জগতে তার প্রতিরূপতাকে খোঁজা আর তৃতীয় স্তর হল নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করে জনসমুদ্রে নিজেকে ব্যাপ্ত করা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উর্বশী ও আর্টেমিসে’র যুগে এক নিঃসঙ্গতায় কবির কাব্য জীবন শুরু হয়েছিল। সেই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে কবি বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন। বারে বারে হতাশা, দ্বিধা তাঁকে নাড়া দিয়েছে। তবে তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টাও রয়েছে তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলিতে।

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘চোরাবালি’তে কবি এই দ্বিধা, সংশয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যে আত্মনিমগ্নতার আশঙ্কা আগের পর্বে দেখা যাচ্ছিল তার সমাপ্তি ঘটল এই পর্বে। ‘টপ্পা ঠুংরি’ কবিতায় ফুটে উঠল সমসাময়িক জীবনের গ্লানির রূপ। তা থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন কবি প্রেমের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তা সার্থক হল না। কবি কি তখন আত্মরতিতে মুক্তির পথ খুঁজবেন? এই প্রশ্নেই কবিতাটি শেষ হয়েছে।

কবিতার শুরুতেই রয়েছে একটি পোস্টকার্ড যা তার প্রিয়ার আগমন বার্তা নিয়ে এসেছে। ‘ছড়টানা স্রোতে’ সুরের মূর্চ্ছনায় কবিহৃদয় প্লাবিত হয়েছে। মনের মধ্যে যেন তাঁর সৃষ্টি হয়েছে ‘পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণি/ রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।’ কবির ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানছে না। এদিকে প্রতীক্ষার পর্বও শেষ হতে চাইছে

গুহ নিয়োগী, শিপ্রা : *টপ্পা ঠুংরি’র বিষ্ণু দে*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৩৪-৩৭

না। সারাটা দিন তার কাটল যেন জিল্‌হা রাগের বিলম্বিত (ধীর) লয়ে।

ক্রমে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। কবির মনে রয়েছে প্রেমের প্রতীক্ষা। তাই কবির কাছে এই সন্ধ্যা কবিতার সন্ধ্যা, সন্ধ্যার রাগিণী পিলু বাঁরোয়া আর গোধূলির রক্তিমাভায় একাকার হয়ে যাওয়ার সন্ধ্যা। তাই কবি বলেছেন,

একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগর হৃদয়ের গোধূলী লগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
তোমার পোস্টকার্ড
আর এলো তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

এখানে 'ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক' কবির মনে প্রেমের প্রতীক্ষাকে আরও গভীর প্রত্যয়যুক্ত করে তুলেছে। 'সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক' পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে আর একবার কবি পরিচয় দিলেন তাঁর হিন্দুস্তানী রাগসংগীতের প্রতি ভালোবাসা, আর পূরবীর (সন্ধ্যার রাগ) বিভাসকে (সকালের রাগ) আশীর্বাদ করার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার আগমন বার্তা।

যান্ত্রিক জীবনে মানুষ যন্ত্রের কাছে পদানত, যন্ত্রের খেয়ালে তাকে জীবন গড়তে হয়। এই যন্ত্র কখনও গতিশীল, কখনও মন্থর। কবি নগরজীবনের এই ব্যস্ততা আর মন্থরতার এক হয়ে থাকাকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

বাসের এ কী শিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট!
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।'

পঁচিশ মিনিট পরেই আসবে ট্রেন, আসবে কবিপ্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিহঙ্গের রূপকে সম্মুখের অন্ধকার দুর্যোগ অতিক্রম করে অবিরাম উড্ডীনের কথা বলেছেন কবির হৃদয়বিহঙ্গ সেখানে প্রিয়ার কাছে পৌঁছনোর জন্য অধীর।

পরের কয়েকটি স্তবকে নগরজীবনের ক্লান্ত জটিলতা, দিনযাপনের গ্লানিতে শত শত মানুষের অসহায় জীবন বর্ণনা মূর্ত হয় উঠেছে। বড়বাজারে জনগণের প্রবল স্রোত। বিড়ি, সিগারেটের ধোঁয়া আর পানের পিক। নাগরিক জীবনযাত্রা মানুষকে করে তুলেছে ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত, অসহায়, শ্রান্ত। বড়সাহেব, বড়বাবুর ভর্ৎসনায় তারা ভীত। আর দাম্পত্যমিলন? সেখানেও আসে শ্রান্তি, সন্তানাধিক্যের অনুশোচনা। ক্লাইভ, ডালহৌসি, বড়বাজার এলাকায় মানুষের কলরোল আর দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্যাক্সি করে যাওয়ার সময় কবির মনের আনন্দ নানা প্রতীকীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। গঙ্গা নদীর বয়ে চলা, স্টিমারের এগিয়ে চলা, খালাসির গান তার কর্মের ক্লান্তি ছাপিয়ে— এসব কবিকে যেন নিয়ে গেছে সব পেয়েছির দেশে। প্রেমের প্রতীক্ষায়, আনন্দে কবি এতই মত্ত যেন মাতালের মতো কোকেনের দেশে নিজেকে মনে করছেন। সব বই পড়ে ফেলার মতো আনন্দ যেন তিনি অনুভব করছেন। সব ক্লান্তিকে ছাপিয়ে তাঁর প্রেমের প্রতীক্ষার আনন্দ, স্টিমারের এগিয়ে চলা আর খালাসির গানের সঙ্গে আবার এক হয়ে গেছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কবি এই স্বপ্নবিচরণ ছেড়ে আবার ফিরে এসেছেন নগরজীবনের ক্লান্ত জটিলতায়। রাস্তায় গাড়ির মিছিল, থমকে দাঁড়ানো ট্রাফিক, মিলের, কলের চোঙার ধোঁয়া এসব আবার মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির

লেখনীতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।' বিষ্ণু দে তাঁকে স্মরণ করে এই পঙ্‌ক্তিকে সামান্য পরিবর্তন করে তাঁর বর্ণনার উপযোগী করে লিখলেন 'জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।' মানুষকে মনে হয়েছে তাঁর সারি সারি পিঁপড়ের মতো। অগণন ভিড়ে আক্রান্ত এই শহর কলকাতা। আবার এই শহরেই মানুষ স্বপ্ন দেখে।

সময় এগিয়ে চলেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন কবির লেখনীতে। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' এই পঙ্‌ক্তিটিকে কবি ব্যবহার করলেন তাঁর প্রতীক্ষার সময় হিসাব করতে। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। এর পরেই আসবে ট্রেন।

কবি মানসচক্ষে দেখছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিতজনের মুখ ট্রেনের জানালায়। তার কণ্ঠস্বরও শুনলেন। কবির মনে হল সেই স্বর যেন প্রভাতের ভৈরবীর সুর। কবির অন্তরে রয়েছে প্রেমের স্বপ্ন তাই তাঁর মনে হয়েছে বহু মানুষের ভিড়ে তিনি এমনই একজন, যিনি নগর জীবনের সব বাধা, কলরোল উপেক্ষা করেই এসেছেন তাঁর স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে। কিন্তু তাঁর আশা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ট্রেন এল কিন্তু সে নেই। কবি যে প্রেমের প্রাপ্তি আশা করেছিলেন,

> ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
> ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
> হাতে হাত উষ্ণতায়
> করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন ! হায়রে !

— তা ব্যর্থতায় ডুবে যায়। কবি হতাশ হয়ে তাই ভেবেছেন তাঁর এই ফাঁকা কামোন্মত্ত হৃদয়কে তিনি এখন কোন পথে চালাবেন ? নিদ্রাহীন জীবনে নিজের মধ্যেই একে অবদমিত করে রাখতে হবে ? এই প্রশ্নেই কবিতার শেষ হয়েছে। এখানে কবি উপলব্ধি করেছেন আধুনিক জীবনে, নগর সভ্যতায়, বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রামে মানুষের জীবনে প্রেম এসেও আসে না।

এই আলোচনায় বিষ্ণু দে-র কবিসত্তার এবং এই কবিতার আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উবর্শী ও আর্টেমিস'-এর 'ছেদ' কবিতায় বলেছেন, 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' '২৫শে বৈশাখ' কবিতায়ও লিখেছেন, 'রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে।' কবির এই ধরনের পঙ্‌ক্তি দেখে অনেক সমালোচক তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার কথা তুলেছেন। কিন্তু ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতি যুগের কবিকেই নতুন পথ সন্ধান করতে হয়। নিজের পথের পথিক হতে হয়। বিষ্ণু দে-কেও নিজের পথ খুঁজতে হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার কোনো দিনও করেননি বরং পরিণত বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। রবীন্দ্র উত্তরাধিকার আত্মস্থ করেই বিষ্ণু দে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশি করে রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে মৌন প্রত্যয়গত যোগ অনুভব করেছেন। রবীন্দ্র কবিতার নানা চিত্রকল্প কবি নিজের কবিতায় বিষয়োপযোগী করে নানান মানসিকতায় ব্যবহার করেছেন। 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতায়ও এরকম বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি আছে যা রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। শুধু কবি এদের ব্যবহার করেছেন ভিন্ন মেজাজে। যেমন— 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর', 'জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান', 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও', 'তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়' ইত্যাদি।

বিষ্ণু দে-র কবিতার আর একটি বিশেষ দিক এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। তাঁর কবিতায় সংগীতের বিশিষ্ট স্থানের কথা সুবিদিত। 'টম্পাঠুংরি' কবিতায়ও দেখা যায় কবিতার নামকরণে যেমন, ভাবপ্রকাশেও তেমনি সংগীত জগতে চলে এসেছেন কবি বারবার। প্রিয়ার আগমন বার্তা শুনেই তার প্রেমিক হৃদয় সঙ্গী খুঁজেছে সংগীত

জগতে। বেহালা, এসরাজ বা সারেঙ্গিতে যেমন ছড় দিয়ে টেনে সুরের মূর্চ্ছনা তোলা হয়, প্রিয়ার আগমনবার্তা হঠাৎ পেয়ে কবির হৃদয়েও যেন প্রেমের একটা টান খেলে গেছে। প্রেমের উদ্ভাবন, প্রেমের উদ্‌বেলতা বোঝাতে এনেছেন পিৎসিকাটোর ঘূর্ণি, রেডিওর ঐকতানকে। কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার অধীরতায় সময়ের গতিকে আমাদের সব সময়ই মন্থর মনে হয়। প্রিয়ামিলনে অধীর কবিরও সময়কে মনে হয়েছে যেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিলম্বিত লয় (সাধারণত ৪৮ মাত্রা বা ২৪ মাত্রায় গাওয়া হয়, গতি ধীর)। সন্ধ্যা এসেছে সঙ্গে রাগিণী নিয়ে। পিলুবারোঁয়া, পূরবী হল সন্ধিক্ষণের রাগ অর্থাৎ দিনশেষ, সন্ধ্যা আগত। কবিরও প্রতীক্ষার মেয়াদ প্রায় শেষ, কবিপ্রিয়া আগত। মানসচক্ষে কবি যখন তাঁর প্রিয়ার মুখ মনে করছেন অন্তরে তাঁর বাজছে ভৈরবী রাগিণী। ভৈরবী সকালের রাগ। দিনের শুরুতে আশা, আনন্দ, উদ্দীপনার সঞ্চার করে এই রাগ। কিন্তু সন্ধ্যাতেও কবির মনে প্রিয়ামিলনের আনন্দে বেজেছে ভৈরবী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের জ্ঞান-সংস্কার ছিল বিষ্ণু দে-র। তাই যে কোনো মহৎ গভীর আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংগীতিক ভাবকল্প, তাঁর কবিতায় অনিবার্যভাবে এসেছে এবং তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে ভাবপ্রকাশের পক্ষে।

ইংরেজি ভাষা, সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক বিষ্ণু দে-র বিদেশি ভাষা সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। তাঁর কবিতার এই বিশেষ দিকটির কথা উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। তাঁর অধিকাংশ কবিতা বিশেষত প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে অনেক ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এরকম শব্দ-পোস্টকার্ড, বাস, ট্রাম, কার, প্রফেসর, ট্রাফিক ইত্যাদি। কখনও কয়েকটি অক্ষর পাশাপাশি ভিন্ন শব্দে বারবার ব্যবহৃত হওয়ায় উচ্চারণগত এক সুন্দর সাধর্ম্য এসেছে— 'ক্লাইভ ডালহুসি লায়নস রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের' বা 'স্টক এক্সচেঞ্জের... ট্যাক্সির হৃদস্পন্দে,ট্রাফিকের এটাক্‌সিয়ায়।' কবিতার শেষে 'লিবিডো' শব্দটির ব্যবহার খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'লিবিডো' মানে কামনা, যৌনতৃষ্ণা। কবিতাটির প্রথম থেকে কবিহৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার, উদ্দীপনা, প্রতীক্ষা, সব বাধা অতিক্রম করে প্রিয়া মিলনে উত্তেজনার ছবি অঙ্কিত হয়েছে— এইসব যেন একটা সমগ্রতায় প্রকাশিত হয়েছে 'লিবিডো' শব্দটির মাধ্যমে। প্রিয়া আসেনি, এই লিবিডোও পূর্ণতা পায়নি, তাই ফাঁকা লিবিডো'। কোনো বাংলা শব্দ অপেক্ষা 'লিবিডো' শব্দটি এখানে বেশি সুপ্রযোজ্য হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আধুনিক বাংলা কবিতা, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

২। বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লে, কলকাতা-৯

বঙ্গে নারীভাবনা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সমকাল

মধুপী পুরকায়স্থ

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের ইতিহাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পুরুষতন্ত্রের সমস্ত বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে ঠাকুরবাড়ির মহিলারাই প্রথম বাংলার নারীদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবীর কথা। রক্ষণশীল পণ্ডিতি সমাজে বাস করেও দিগম্বরী স্বামীর অনাচারকে মেনে নিতে পারেননি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান অনুসারে দিগম্বরী স্বামী সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু প্রতিদিন সকালে স্বামীর শয্যার কাছে গিয়ে মাটিতে প্রণাম করে আসতেন। যে যুগে পতিকে পরমেশ্বর জ্ঞান করে পতির সমস্ত ব্যভিচারকে বিনা প্রতিবাদ মেনে নেওয়ার রীতি ছিল, সেই জায়গায় পতিকে মানুষ মনে করে স্বামী সংস্রব ত্যাগ করার যে মানসিক স্বাধীন সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দিগম্বরী প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে বাংলার ইতিহাসে নারী স্বাধীনতার বীজ সেদিনই রোপিত হয়েছিল।

এই তেজস্বিনী মহিলারই নাতনি ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুরপরিবারের সংস্কারমুখিন পরিবেশে স্বর্ণকুমারীর যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তারই প্রভাবে তিনি মেয়েদের অসহায়তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ এবং লেখালিখির মাধ্যমে তিনি সমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। সমাজ এবং দেশের উন্নতির জন্য নারীজাতির উন্নতি প্রয়োজন, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

> ... জাতির এক অংশের সহিত অপর অংশের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটিকে অশিক্ষিত রাখিয়া অপরটির শিক্ষা কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত না হইলে সমাজ যে আধাআধি রকমে ক্ষতি-গ্রস্ত হইল এমন নহে, জাতির সম্যক উন্নতি স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিত রাখিয়া পুরুষেরা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না।[১]

অসহায় কুমারী এবং বিধবা মেয়েরা যে নিদারুণ সামাজিক নিষ্পেষণের শিকার হয় সেজন্য তিনি নারীর

পুরকায়স্থ, মধুপী : *বঙ্গে নারীভাবনা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সমকাল*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৩৮-৪৭

অর্থনৈতিক সক্ষমতার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর 'স্নেহলতা বা পালিতা' এবং 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে এইসব অসহায় মেয়েদের কথা তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পগুলি পাঠকালে বোঝা যায় যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তিনি এইসব সামাজিক সমস্যাকে বিচার করেছিলেন। তাঁর এই ভাবনাই রূপ পেয়েছিল 'সখিসমিতি'র মধ্যে।

> ১২৯৮ সালের পৌষ মাস থেকে সখি সমিতি ছয়টি বালিকার ভরণ পোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল— সখি সমিতির আয়-ব্যয়ের বিবরণী থেকে জানা যায় 'শশিপদবাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকা' এবং 'বেথুন স্কুলে দেওয়া ৮টি বালিকার' খবর।[২]

স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী 'সখিসমিতি'র নারীকল্যাণমূলক কাজে মায়ের সহায়তা করতেন। পরবর্তীকালে 'সখিসমিতি'র প্রভাব কমে গেলে হিরণ্ময়ী দেবী তাকে উজ্জীবিত করে তোলেন ১৯০৬ সালে 'বিধবা শিল্পাশ্রম' নাম দিয়ে। বিধবা শিল্পাশ্রমের অধ্যক্ষ সভার নাম ছিল 'সখি-শিল্প-সমিতি'। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী (১৮৩৪-১৯৩২), সুচারু দেবী (১৮৭৮-১৯৫৯) এই অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন। শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানীর কন্যা উমারানী (১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত) এই শিল্পাশ্রমের সেক্রেটারি ছিলেন। সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

> মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখি-সমিতি যখন কাল প্রভাবে ম্রিয়মান হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হতে এসেছিল। মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম।[৩]

স্বর্ণকুমারীর ইচ্ছে ছিল বোম্বাইতে পণ্ডিতা রমাবাই যে বিধবাশ্রম স্থাপন করেছিলেন, ঠিক তারই মতো বাংলার অসহায় নিরাশ্রিতা বিধবাদের জন্য একটি বিধবাশ্রম গড়ে তোলেন। হিরণ্ময়ীর 'বিধবা শিল্পাশ্রম' স্থাপনের মধ্যে দিয়েই তাঁর ইচ্ছে রূপলাভ করে। ১৯২৫ সালে হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর এই বিধবা শিল্পাশ্রমের নাম হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

শিল্পবিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাংলার নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে সমাজ সচেতনতা এবং রাজনৈতিক চেতনার সমন্বয়ে। সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহ আইন, সহবাস সম্মতি বিল ঘোষিত হবার পর সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। উনিশ শতকের শেষে ধীরে ধীরে প্রতিমায়িত নারীর আড়াল থেকে নারীসত্তার প্রকাশ হতে থাকে। এই পথ নিতান্ত সহজ ছিল না। ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় কিছু প্রগতিকামী পুরুষের চেষ্টায় নারীর অর্গলমুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু এই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও নারীমুক্তি সর্ম্পকে মতভেদ ছিল। কারণ নারীসম্পর্কিত চিরাচরিত সামাজিক ধারণা থেকে মুক্তমনে বেরিয়ে আসতে পারেননি অনেকেই। তাই প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' (১২৭৭) সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অভিমত দিয়েছিল—

> এই আশা করি কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী-জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চির

কালই সেইরূপ দেখিতে পাইব।[৪]

স্ত্রীর কাছ থেকে মানসিক নির্ভরতা পাওয়ার জন্যই তাঁরা নারীকে অল্প শিক্ষা এবং অল্প স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষার আলোক পাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের পথ নিজেরাই তৈরি করে নিতে লাগলেন। নারীজাগরণ থেকে আন্দোলনের পর্বে রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০), সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) প্রমুখ মহিলার আত্মজীবনী থেকে সে সময়কার মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এঁদের লেখায় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, বৈষম্য এবং সমাজের বাধানিষেধের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ থাকলেও এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখা যায় না। তবুও তাঁদের রচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে নিজেদের অনধিকার এবং পরাধীনতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হচ্ছিলেন।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তখন মহিলাদের পক্ষে প্রকাশ্যে সভাসমিতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। মহিলাদের জন্য সভা-সমিতি গঠন করে তাঁদের সংগঠিত করার জন্য প্রগতিকামী পুরুষেরাই তখন এগিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে সভায় যোগ দিতে থাকেন। বাংলার নারী আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়—

> মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, বিধবা বিবাহের প্রসার করা, কুলীন বিয়ে বন্ধ করা প্রভৃতি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলার ব্রাহ্মরা নারীকে সামাজিক দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছেন।[৫]

বাংলার নারীজাগরণে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা বাঙালি মেয়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্য ও ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা এবং বধূ বলেই সমাজের পরোয়া তাঁদের করতে হয়নি। শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে এক আধুনিক জগতের সন্ধান তাঁরা বাঙালি মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

একটা জিনিস লক্ষণীয় যে উনিশ শতকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক বিকাশ ছাড়া মেয়েদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, একথা কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করেছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা ও অনেক প্রগতিকামী মহিলা মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলা দেবী চৌধুরানী ও রোকেয়া সাখাওয়াৎ প্রমুখ।

> পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে এঁরা নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিলেন। নির্যাতিতা নারীদের ঘটনা বর্ণনা করে তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, বিভিন্নভাবে নিপীড়িত নারীসমাজ মুক্তির প্রত্যাশায় প্রবলভাবে আলোড়িত হলেও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীলতার কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। সেজন্য তাঁরা বললেন যে, নিপীড়িত নারীসমাজ নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বা নিজে জীবিকা অর্জন না করলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার জন্য সামাজিক পারিবারিক নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে না।[৬]

সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও অনেক মহিলা স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন। নারীসমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হলে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচন প্রয়োজন— নারী-আন্দোলনের সূচনাপর্বে এ কথা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল'-এর সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দি

হলে নারী সমাজকে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সরলাদেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় বেথুন স্কুলে কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু প্রমুখ ছাত্রীর নেতৃত্বে মেয়েদের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল,

> ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন বাঁড়ুয্যে যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালরঙের ফিতে আস্তিনে বাঁধলুম। কেন তা ঠিক জানতুম না। কিন্তু রাস্তায় স্কুলযাত্রী অনেক ছেলেদের হাতেও সেইরকম ফিতে দেখে একটা সহবেদনার বৈদ্যুতী খেলতে লাগল মনে। একটা বড় কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি অনুভব করতে লাগলাম।[৭]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসের কাজকর্মে মহিলাদের এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজীবন জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতিচর্চাও করেন।

> ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশনে ছয়জন মহিলা ডেলিগেট যোগ দেন। এঁদের মধ্যে বাংলার স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী অন্যতম। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। সভা শেষে কাদম্বিনী দেবী সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।[৮]

এ প্রসঙ্গে ভারতের নারী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী অ্যানি বেসান্তের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল—

> One of the delegates Mrs. Kadambini Ganguly was called on to move the vote of thanks to the chairman, the first woman who spoke from the Congress platform, a symbol that Indian's freedom would uplift Indian's womanhood.[৯]

১৮৯০ সালে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনেও স্বর্ণকুমারী ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> ১৮৯০ খিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী "প্রতিনিধি"-রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। আর কোন মহিলা প্রতিনিধি রূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।[১০]

কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা থেকে জানা যায়—

> সুসাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচজন মহিলা এবারকার অধিবেশনে যোগদান করেন। কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেও ছিলেন।[১১]

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'স্বর্ণস্মৃতি' নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে—

> ... ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় যখন সার ফিরোজ সাহ মেটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়, তখন ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি উহাতে 'প্রতিনিধি' রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় রমণী কংগ্রেসে প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই।[১২]

মালেকা বেগম রচিত 'বাংলার নারী আন্দোলন' বইটিতেও একই তথ্য পাওয়া যায়।

> ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হয়। সভা শেষে কাদম্বিনী দেবী সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।[১৩]

রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলার নারীসমাজের মুক্তির জন্য সাংগঠনিক কাজকর্ম ও আন্দোলন করে গেছেন।

সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) সমকালে জন্ম হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৬)। পরিবারের অভ্যন্তরে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত ছিল। নবোদ্ভুত জাতীয় আন্দোলনের পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে,

> ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রসমূহ, মহারাষ্ট্র সভা, আর্যসমাজ, সনাতন সভা প্রভৃতির উদ্যোগে এই জাতীয়তাকামী আন্দোলন ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।[১৪]

তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতেও এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার স্ফুরণ হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় সংগীত রচনা করে তিনি স্বদেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন,

> শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূতনাম,
> মায়ের রাখিম মান— লয়েছি এ মহাব্রত।
> আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর নই শিক্ষা,
> এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত। [১৫]

স্বর্ণকুমারীর পুত্র-কন্যারা মায়ের স্বদেশভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মায়ের সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী। 'বিধবা শিল্পাশ্রম' তারই ফলশ্রুতি। স্বর্ণকুমারী চাইতেন দেশের নারীরা মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জন করুক। জীবনের ঝরাপাতায় সরলা দেবী লিখেছেন—

> আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন— সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।[১৬]

তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাসের রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটির মধ্যে সরলাদেবীর জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। সরলার মতোই জ্যোতির্ময়ীকে ব্যায়াম সমিতি স্থাপন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নির্মাণ, বীরাষ্টমী উৎসব ও রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়।

> ...১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) মহাষ্টমীর দিন 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তন করলেন সরলা, যার উদ্দেশ্য বাংলাদেশে শক্তিচর্চার প্রসার। পরের বছর, ১৩১০ সালে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) মহাষ্টমীর দিন বীরাষ্টমী উৎসব হল স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতেই। ...ব্যায়াম প্রদর্শনী, লাঠি-খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, দেশি-তরবারি খেলা, ছোরা খেলা ছাড়াও সে উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের স্তোত্র পাঠ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পদক-বিতরণ।[১৭]

মায়ের 'সখিসমিতি' এবং দিদির মহিলা শিল্পাশ্রম পূর্ণতর রূপ পেয়েছিল সরলা দেবীর 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'-এর পরিকল্পনায়।

সমাজে ব্যল্যবিবাহ তখনও প্রচলিত ছিল। তাই অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'-এর মতো একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সরলা দেবী।

স্বর্ণকুমারীর এই স্বাধীনচেতা কন্যাটি গতানুগতিকতার পথ ধরে চলেননি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরের মহারানি গার্লস স্কুলে চাকরি করতে গিয়েছিলেন সরলা দেবী।

> ... মেয়েদের বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার মতো ঘটনা এই প্রথম ঘটল মহর্ষি পরিবারে।[১৮]

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমগ্র দেশে এক উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন সরলা দেবী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। হিংসার রাজনীতি তিনি সমর্থন করতেন না।

> ১৯০৫-এর বঙ্গ বিচ্ছেদের ক্ষত বাংলার মানুষের মনে তখনো সজীব, তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে বিদেশি দ্রব্য বর্জন (বয়কট) আর স্বদেশি আন্দোলন। ১৯০৭ খিষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের নরম আর চরমপন্থী দলের বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর বাংলাদেশে বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ বেড়ে উঠেছে ১৯০৮-এ বাংলার কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যাকাণ্ডের ত্রাসে ত্রাসে গুপ্তহত্যা ও স্বদেশি ডাকাতি অনেক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের কার্যসূচীর অঙ্গ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।[১৯]

সমসাময়িক রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায়। তাঁর রচিত প্রবন্ধ, গল্প এবং উপন্যাসে নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

> ... কে জানিত বঙ্গ বালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা সৃজন করিতে পারে! কিন্তু এরূপ কার্য্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল, ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের স্বরাজের প্রকৃত পথ, তাহা নির্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্তব্য।[২০]

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দেখতে পাওয়া যায় শেষ ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) এবং 'নবডাকাতের ডায়েরী' গল্পে। 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসের রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীকে বলতে শোনা যায়—

> ... আমাদের পথ তো অত্যাচারের পথ নয়। আমাদের জীবনের সার্থকতা, কার্য্যের সফলতা আত্মপাতে ; রক্তপাতকে কখনো যেন আমরা গৌরবের কার্য বলে বিবেচনা না-করি।[২১]

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক বোধের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর 'ত্রয়ী' উপন্যাসের চিন্তাধারার মিল রয়েছে।

আবার 'নবডাকাতের ডায়েরি' গল্পে সহৃদয় কেমিক্যাল সাহেবকে বলতে শুনি—

> ... ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই। প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়।[২২]

দেশি কলকারখানা, দেশি শিল্পদ্রব্য এবং দেশি সার্কাসের প্রতি আগ্রহ ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর। ঠাকুরপরিবারে এই স্বদেশপ্রীতি সদাজাগ্রত ছিল। সরলা দেবী লিখেছিলেন—

> নতুনমামা একদিন আমাদের কোনো একটা সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলেন— একটা বাঙালীর ও একটা উইলসন সাহেবের— যেটায় আমাদের অভিরুচি। আমি বললুম— "বাঙালীর সার্কাসে যাব।" টাটকা বিলেত প্রত্যাগত মেজমামীর ছেলেমেয়েরা বললেন, সাহেবের সার্কাসে যাবেন,... নতুন মামাও স্বদেশি। তাই সেবারটা বাঙালী সার্কাসেই যাওয়া হল। বড় হয়ে মেজামামীর ছেলেমেয়েরাও ক্রমে ক্রমে বিচারে-আচারে স্বদেশি হতে লাগলেন।[২৩]

বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ সম্পর্কে যে কারণ দেখিয়েছেন তা তাঁর সুগভীর বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন। 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর কথায় স্বর্ণকুমারীর চিন্তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

> ... বিলিতি জিনিস একেবারে বর্জন করার সময় এখন আসেনি। সেইজন্য কিছুদিন ধরে এখনো আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ভেবে দেখ দু'বেলা দু'মুষ্টি অন্ন যেসব লোকের মেলে না, তাঁতের দামী কাপড় কিনে পরা কি তাদের সাধ্য? তাঁত শিল্পকে উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানারও বিস্তৃতির আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।[২৪]

আবার 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ... এখানেও ধৈর্য্যের আবশ্যক। দোকানদারের বিদেশী জিনিষ নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশী গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে বুঝাইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্যদিকে দ্রব্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ মূল্য সুলভ তাই স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশী বর্জ্জনের সহজ এবং স্থায়ী উপায়।[২৫]

দেশের নারীসমাজও যে স্বাধীনতার একটা অঙ্গ সে সম্পর্কে তিনি দেশের আন্দোলনকারীদের সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। 'গুরুকুল সমাচার পত্রে' প্রকাশিত একটি রচনায় এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> নারীগণের অন্তঃপুর কারাগৃহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা-ভোগের বিরোধী অথচ তাঁহারা পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত নহেন।[২৬]

১৯১১ সালে Green Park-এ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর একটি 'সোস্যাল কনফারেন্স' হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী। সভায় সরলা দেবী ও সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা দেন। স্বর্ণকুমারীও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। Indian Marriage Act-এর প্রথমেই যে declarationটি ছিল— "I am neither a Hindu, a Mahomedan, nor a Christian."[২৭]

সেটি তুলে দেওয়ার পক্ষে প্রস্তাব এনেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু ওই প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ declarationটি থাকার পক্ষে ভোট দেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ও রামভজ দত্ত চৌধুরী। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বর্ধমান রাজের আপত্তি থাকায় সরকার ওই বিল সমর্থন করেনি।

১৯১৫ সালের চৈত্র মাসে মেরি কার্পেন্টার হলে মহাত্মা গান্ধীর পত্নী কস্তুরবা গান্ধীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণের পর স্বর্ণকুমারী দেবী অভিনন্দন পাঠ করেন। ১৯২৬ সালে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণকুমারী 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক'-এ সম্মানিত হন। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক।

> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রতিভার আদর করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পুরুষশার্দ্দূল স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার রত্নগর্ভা জননী জগত্তারিণী দেবীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদান করিবার জন্য একটি সুবর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উহা বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকাকে প্রদত্ত হয়। স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্য সেবার জন্য এই পদক পুরস্কার প্রদত্ত হয়।[২৮]

১৯৩০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতাবশত সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারায় সর্বসম্মতিক্রমে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন স্বর্ণকুমারী দেবী।

> বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতিত্বে কোনো মহিলা-লেখকের দায়িত্ব অর্জনের ঘটনা সেই প্রথম ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় লিখিত ভাষণটি সম্মিলনের শেষ দিনে পাঠকরেন স্বর্ণকুমারী দেবী ; আর স্বর্ণকুমারীর সম্মিলনে-প্রদত্ত অভিভাষণটিই তাঁর 'ভারত-সাহিত্যে রমণী প্রতিভা' নামে সুপরিচিত প্রবন্ধ।[২৯]

কবি মানকুমারী বসু এই অধিবেশনে 'আমার মা' কবিতাটি পাঠ করে স্বর্ণকুমারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মোজাম্মেল হক 'অনন্ত দুঃখ' কবিতাটির অষ্টম স্তবকে স্বর্ণকুমারীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান।

স্বর্ণকুমারীর কাশিয়াবাগানের বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমন হয়েছিল। তাঁর ৩ নং সানি পার্কের বাড়িতে ত্রিপুরার বড় ঠাকুর, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, দার্শনিক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়, তারকনাথ পালিত, বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি আসতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

স্বর্ণকুমারীর কাজকর্ম ছিল খুব প্রণালিবদ্ধ। সব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ফাইলের মধ্যে সাজানো থাকত। মন্মনাথ ঘোষ লিখেছেন—

> বাণীসেবায় তাঁহার বিরাম ছিল না, সাহিত্য সাধনায় তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। কতদিন তাঁহাকে ছাপাখানার সম্মুখে গাড়িতে বসিয়া শেষ প্রুফ সংশোধন করিতে দেখিয়াছি।[৩০]

ছিয়াত্তর বছরের জীবনে স্বর্ণকুমারী ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংকলিত 'সাহিত্যস্রোত' গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁর 'ভারত-সাহিত্যে রমণী প্রতিভা' প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সাহিত্য স্রোতে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় যে মারা যাওয়ার বছর খানেক আগেও স্বর্ণকুমারী গানে সুর ও direction দিতেন।

১৯৩২ সালের ২৮ জুন, মঙ্গলবার সানি পার্কের বাড়িতে স্বর্ণকুমারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। ৩ জুলাই সকাল সোয়া দশটায় তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। 'স্বর্ণ-স্মৃতি'-তে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছিলেন—

> ... শেষ সাক্ষাতের দিনে সাহিত্যালোচনায় তাঁহার যে উৎসাহের অগ্নিশিখা, নয়নে যে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা যে এত শীঘ্র নির্ব্বাণলাভ করিবে তাহা কে জানিত? যাহারা আমাদের মত তাহাকে অল্পকালও দেখিবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন সাহিত্য প্রেমের এই স্বর্ণপ্রতিমা, বাণীসেবার এই মূর্তিমতী নিষ্ঠা কত সাহিত্যসেবকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, কত অভিনব প্রেরণা দান করিয়াছেন।[৩১]

'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'জয়শ্রী', প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। 'The Modern Review' পত্রিকার আগস্ট ১৯৩২ সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হয়—

> She was the first among our ladies to edit a monthly. The Calcutta University honoured her by conferring on her the Jagatarini Medal in 1926. She was the elected President of the 29^{th} session of the Bengali literary conference.She was the first lady to act as its President. It required great courage in those days.The women of Bengal are now enjoying the benefits of her and her collegues and

> successors' courage and of the obloquy which fell to their lot.[৩২]

১৯৩৯ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

> স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীসমাজের যে ক্ষতি হয় তার পরিমাপ করা কঠিন। তার লেখায় ও কর্মে সর্ব বিষয়েই তিনি বাঙালীর মেয়েদের প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন, মেয়েদের সকলরকম প্রচেষ্টাতেই তিনি ছিলেন অগ্রণী।[৩৩]

উনিশ শতকে যে সকল মহিলা দেশকে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের এগিয়ে চলার পথে তাঁদের স্বামীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। রক্ষণশীল সমাজ-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রগতিশীল পুরুষেরা মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই সুগৃহিণী এবং সুমাতা হওয়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রমীরাও ছিলেন। যাঁরা নারীজাগরণের ধ্বজাকে তুলে ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন আগামীর পথে। স্বর্ণকুমারী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতে রয়েছে যুগের বাধাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা। তিনি যে যুগের মেয়ে সেই যুগের মেয়েদের ইচ্ছে থাকলেও সেই ইচ্ছেকে রূপায়িত করার শক্তি ছিল না। সেই সব মেয়েদের কথাই তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর গল্প, উপন্যাসে। গভীর আত্মমগ্নতার ভেতর দিয়ে তিনি জীবনকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাজের মধ্যে দিয়ে মনের এই প্রসারতাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বর্ণকুমারী।

স্বর্ণকুমারীর কর্মবহুল জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় সমসাময়িক পুরুষ সাহিত্যিকদের তুলনায় কোনো অংশেই তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন তা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে পুরুষ এবং নারীর লৈঙ্গিক বিভাজনে মেয়েদের মনন ও সৃজনের সম্মাননা সহজলভ্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারী দেবী আলোচিত হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি প্রত্যাশিত সমাদর লাভ করেনি। পাশ্চাত্য দেশের মানুষ অতীত সচেতন। তাই তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায়ে আগ্রহী। উনিশ শতকের নারী জাগরণের সন্ধিকালে পুরুষের পাশে নারীর সম-অধিকার লাভের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, সেই ইতিহাসকে জানার জন্য স্বর্ণকুমারীর কীর্তিকে স্বমহিমায় তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি

১. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৫৯।
২. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩৩।
৩. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৬০।
৪. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েদের লেখালেখি', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৬০।
৫. বেগম, মালেকা, 'বাংলার নারী আন্দোলন', দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৩৯।
৬. তদেব।
৭. চৌধুরানী, সরলা দেবী, 'জীবনের ঝরাপাতা', রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮।
৮. বেগম, মালেকা, 'বাংলার নারী আন্দোলন', দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৭০।
৯. তদেব।
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা ২৬।
১১. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১০১।

১২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৫।
১৩. বেগম, মালেকা, ‘বাংলার নারী আন্দোলন’, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ৭০।
১৪. শাশমল, পশুপতি, ‘স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৭৮।
১৫. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৫৫।
১৬. চৌধুরানী, সরলা দেবী, ‘জীবনের ঝরাপাতা’, রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০১।
১৭. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৪৪।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
২০. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৯৮।
২১. ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃষ্ঠা ৯৫৬।
২২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৭০।
২৩. চৌধুরানী, সরলা দেবী, ‘জীবনের ঝরাপাতা’, রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮।
২৪. ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃষ্ঠা ২৯৩।
২৫. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৯৩।
২৬. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩০।
২৭. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১০৬।
২৮. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৬।
২৯. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৫২।
৩০. দেবী, স্বর্ণকুমারী, ‘রচনা-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১৭।
৩১. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৩।
৩২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৭।
৩৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৫৫।

রাভা সাহিত্য ও চাম্পাই

দেবযানী দে

ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সাময়িকপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যে কোনো জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি হল সাময়িকপত্র। জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার পূর্ণ পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আবার,

> কবি সাহিত্যিকদের মৌলিক ভাবভাবনার সৃষ্টি সম্পদ ও প্রকাশের সুযোগ করে দেয় সাময়িকপত্র। সাময়িকপত্র যে কোনো লেখকের প্রতিভা বিকাশের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল তৈরি করে।[১]

সাহিত্যিকদের সাহিত্যরচনার মঞ্চ হিসেবে ও সাময়িকপত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে বিভিন্ন সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করে প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলেন। ভাষা বিকাশে ও সাময়িক পত্রের এক বিরাট ভূমিকা থাকে। সাময়িকপত্রের পরিসর বিস্তৃত— সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি। সাহিত্যিক সাময়িক পত্রগুলো সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে তোলে। সাহিত্য পত্রিকা হল একটি পত্রিকা যেখানে সৃষ্টিশীল লেখা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকায় সাধারণত ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা, উপন্যাস, শিল্প ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি থাকে।

রাভা সাহিত্যের বিকাশে 'চাম্পাই' পত্রিকার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পত্রিকাটি রাভা জনজাতির একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র। রাভা জনজাতির বসবাস মূলত অসমের গোয়ালপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়ে বিস্তৃত। অসমে বসবাসকারী রাভারা অসমের বৃহত্তর অসমিয়া সংস্কৃতি, সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অসমিয়া সমাজ ও সাহিত্যের প্রবল প্রভাব রাভা সমাজ ও সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার মধ্যেও রাভারা তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ভোলেনি।

'চাম্পাই' পত্রিকাকে রাভা জাতির সাহিত্যিক মুখপত্র বলা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালে রাভা পত্রিকা 'জাতিনী খুরাঙ' প্রকাশিত হয়। আর তখন থেকেই রাভা সাহিত্যের পথ চলা শুরু। প্রকাশ রাভা ছিলেন এর

দে, দেবযানী : *রাভা সাহিত্য ও চাম্পাই*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৪৮-৫১

সম্পাদক। তারপর ১৯৭৮ সালে রাভা জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'চাম্পাই' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এই 'চাম্পাই'কে ভিত্তি করেই রাভা সাহিত্যের যথার্থ সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে এই দুটো পত্রিকাই রাভা সাহিত্যের কবিতা, গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির ক্রমবিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭৮ সালে 'চাম্পাই' লিস্থি রাভা রংখ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকা 'চাম্পাই' শুধুমাত্র পত্রিকার ইতিহাসে নয়, রাভা জাতির সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের দিক থেকেও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচ্য। একে কেন্দ্র করে যে একটা সাহিত্যিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তা সত্যিই অভাবনীয়। এই পত্রিকাকে আশ্রয় করেই রাভা সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রকাশ রাভা, লিস্থি রাভা রংখ, চারুমোহন রাভা, সোমেশ্বর রাভা, উপেন রাভা হাকাসাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবযুগ সৃষ্টিকারী 'চাম্পাই' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রাভা সাহিত্যেকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়।

পূর্ব চাম্পাই যুগ
চাম্পাই যুগ
উত্তর চাম্পাই যুগ

পূর্ব চাম্পাই যুগ (১৯৫০-১৯৭৮) : এই সময় রাভা ভাষা ও সাহিত্যের বিপ্লবের সময় বলা যেতে পারে। রাভাদের মধ্যে এই সময় তাদের ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা আনার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়সীমাতেই রাভা ভাষা শিক্ষার জন্য এই ভাষায় ব্যাকরণ, শব্দকোষ ইত্যাদির বই প্রকাশনা শুরু হয়। এর ফলে রাভা সাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই সময়েই কাব্যিক ও গীতধর্মী সাহিত্যরচনার অঙ্কুরোদগম ঘটে। এই যুগের সাহিত্য পত্রিকা বাড়ুঙডুপ্পা (১৯৬১ সম্পাদক সমর সিং রাভা) ও 'জাতিনী খুরাঙ' (১৯৭৩ সম্পাদক প্রকাশ রাভা)-এ গীতধর্মী ও কাব্যিক রচনাগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। নাট্যসাহিত্যেরও সূত্রপাত এই সময়। ১৯৫৭ সালে প্রসন্নকুমার পাম-এর রচিত 'দোদানবীর' নামক কিংবদন্তি নাটক রচনা রাভা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

চাম্পাই যুগ (১৯৭৮-১৯৮২) : রাভা সাহিত্য পত্রিকা 'চাম্পাই' লিস্থি রাভা রংখ-এর সম্পাদনায় চারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত,

> ১৯৭৮ চনত দুটা সংখ্যা ১৯৮০ চনত এটা সংখ্যা আৰু ১৯৮২ চনত এটা (মুঠ চাৰিটা) সংখ্যাৰে প্ৰকাশিত 'চাম্পায়' নামৰ আলোচনীৰ পাতত কবিতা, নাটক, গল্প তত্বগধুৰ প্ৰবন্ধ আদি ৰচনা কৰি লেখক ৰূপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ যোগেদি এই স্তৰৰ সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰে।[২]

অর্থাৎ

১৯৭৮ সনে দুটি সংখ্যা, ১৯৮০ সনে একটি সংখ্যা এবং ১৯৮২ সনে একটি (মোট চারটি) সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাম্পাই' নামের পত্রিকার পাতায় কবিতা, নাটক, গল্প, তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে লেখকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করা বিশেষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে এই স্তরের সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। 'চাম্পাই' যদিও স্বল্পায়ু তথাপি এই চাম্পাই যুগ ছিল রাভা সাহিত্যের রেনেসাঁস যুগ। কেননা গদ্য, কবিতা উভয় সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করে এই যুগে। কয়েকজন রাভা লেখক নতুন বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা শুরু করেছিলেন যেমন বিজ্ঞান, উপন্যাস, শিক্ষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি। রাভা ছোটগল্প, প্রহসন, জীবনী, লৌকিক কাহিনি, লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উত্থানের সময় এই যুগ। তাই এই যুগকে রাভা সাহিত্যের রেনেসাঁস যুগ বলা যেতে পারে। আর

এই সমস্ত সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয়ের রচনাগুলো সাহিত্য পত্রিকা 'চাম্পাই'তে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল।

সাহিত্য পত্রিকা 'চাম্পাই'কে সমগ্র রাভা জাতির সর্বাত্মক উন্নতির মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে পূর্ব 'চাম্পাই' যে যুগ তা রাভা সাহিত্যের একটি নতুন যুগের প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস। 'চাম্পাই'-এ প্রস্তুতির পূর্ণ পরিণাম। নবযুগের বাণীর সম্ভার 'চাম্পাই'ই রাভাদের হৃদয় দুয়ারে পৌঁছে দেয়। রাভা জাতির ভাষার প্রাণশক্তি যে কত বেগবতী ও বৈচিত্র্যময় তা 'চাম্পাই' পূর্ণায়তভাবে জাগ্রত করে দেয়।

'চাম্পাই' একটি যুগ। একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। একটি নতুন আদর্শের ও জাতীয় চেতনার বার্তাবাহী। 'চাম্পাই'-এর লেখকগোষ্ঠী নানা প্রকার রচনাসম্ভারে 'চাম্পাই'-এর কলেবর ভরিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন। বিচিত্র স্বাদের রচনায় 'চাম্পাই'-এর কলেবর সুপুষ্ট থাকত বলে পত্রিকাটি রাভা জাতির হৃদয় জয় করে নেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই যুগ রাভা সাহিত্যের সাফল্যের যুগ। এই যুগে রাভা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক গদ্য, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর তা সম্ভব হয়েছিল 'চাম্পাই'-এর জন্য কেননা কবি সাহিত্যিকদের সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ প্রকাশের সুযোগ করে দেয় 'চাম্পাই'। আর কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার মঞ্চ হিসেবেও 'চাম্পাই'-এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কার সাহিত্যিকদের সাহিত্য বিকাশে 'চাম্পাই'-এর অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেমন—

> চাম্পায় আলোচনীৰ যোগেদী কবি হিচাপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কৰা এগৰাকী ৰাভা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ গৱেষক হ'ল চাৰুমোহন ৰাভা (দাবাং)। চাম্পায় আলোচনীৰ প্রথম সংখ্যাতে তেখেতৰ ৰচিত "ৰাখু চিঙা বীল বুধি" নামৰ কবিতা প্রকাশ পায়।... চাম্পায় আলোচনীৰ পাততেই কলা-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধৰে তেখেতে প্রাবন্ধিকৰূপে খ্যাতি লাভ কৰে।[৩]

অর্থাৎ

'চাম্পাই' পত্রিকার মাধ্যমে কবি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা রাভা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন গবেষক হলেন চারুমোহন রাভা (দাবাং)। 'চাম্পাই' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর রচিত "রাখু চিঙা বীল বুধি" নামের কবিতা প্রকাশ পায়।... 'চাম্পাই' পত্রিকার পাতাতেই তিনি কলা-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রাবন্ধিকরূপেও খ্যাতি লাভ করেন। রাভা সাহিত্যের সাহিত্যিকরা 'চাম্পাই'কে অবলম্বন করে রাভা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছেন।

এখানে আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে রাভা ছোটগল্প লেখার ধারা শুরু হয়েছিল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। নবীন লেখক দুর্যোধন রাভার ছোটাগল্প 'টুখুর সাবরা' 'চাম্পাই'-এর চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। খুব সম্ভবত এটি রাভা ভাষায় রচিত প্রথম ছোট গল্প। আর তখন থেকেই রাভারা 'চাম্পাই'-এর পাতায় প্রথম ছোটগল্পের সঙ্গে পরিচিত হল। শুধু তাই নয় প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার লিস্টি রাভার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'চাম্পাই' পত্রিকা রাভা কাব্যের জগতে নতুন আলোর সূচনা করে। অনেক কবিদের কবিতা প্রকাশেরও সুযোগ করে দেয় 'চাম্পাই' তার পৃষ্ঠায়। ছোটগল্পের পাশাপাশি অনেক কবিতাও 'চাম্পাই'তে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন উপেন রাভার রচিত রাভা কবিতা 'হাণ্ডারময়'। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে প্রাক্ চাম্পাই যুগের বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় চেতনা কিন্তু চাম্পাই যুগের কবিতার বিষয়বস্তু হল ইতিহাস চেতনা, দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিগত প্রেম-প্রণয়ের আবেগিক প্রকাশ।

এই যুগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুবাদের ধারা। আর এই সমস্ত অনুবাদকর্ম কিছু কিছু 'চাম্পাই'তে প্রকাশিত হচ্ছিল। যে সমস্ত অনুবাদকর্ম শুরু হয়েছিল তা প্রধানত ছিল অসমিয়া কবিতা রাভা ভাষায় অনুবাদ।

উত্তর চাম্পাই যুগ : 'চাম্পাই'-এ সৃষ্টি করা রাভা সাহিত্যের জাগরণের পথ ধরে পরবর্তী যুগে রাভা ভাষা ও সাহিত্য উন্নত রূপ ধারণ করেছিল বিভিন্ন রাভা সাহিত্যিকদের সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। রাভা ভাষাও সাহিত্যে বর্তমান যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তার জন্য 'চাম্পাই'-এর মুখ্য ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার্য। 'চাম্পাই' রাভাদের রাভা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। পাশাপাশি তাদের ভাষা সজাগতা জাগ্রত করে তুলেছিল। ১৯৮৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শৈক্ষিক বিষয় হিসেবে রাভা ভাষা প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। ছোটগল্প, উপন্যাস ছাড়া নানা ধরনের সাহিত্যিক রচনা যেমন স্মৃতিকথা, ভ্রমণকথা, জীবনী ইত্যাদি শুরু হয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাহিত্যিক সমালোচনার ধারার সূত্রপাত হয় এই যুগেই।

জাতীয় চেতনা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে কবিতাগ্রন্থ রাভা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি জগৎনামা অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন যেগুলো 'ডঙ্চানাবে' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ৪০টি রোমান্টিক কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'মাদাপকায় গাঠিনি খুরাং' প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকে।

শুধু কবিতাগ্রন্থ নয়, ছোটগল্পের সংকলন 'প্রামচিনা থেকায়' ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'চাম্পাই'তে যে প্রথম ছোটগল্পের বীজ রোপিত হয়েছিল তারই বিকশিত রূপ হল এইটি।

'চাম্পাই' রাভা সাহিত্য যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব 'চাম্পাই' পরবর্তী যুগেও লক্ষ্য করা যায়। 'চাম্পাই' যুগের কিছু সাহিত্যিক 'চাম্পাই' পরবর্তী যুগেও রাভা সাহিত্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই বিশিষ্ট রাভা সাহিত্যকরা হলেন প্রকাশ রাভা, লিস্টি রাভা রংখ, উপেন রাভা হাকাসাম, চারুমোহন রাভা। উল্লেখযোগ্য 'চাম্পাই'কে কেন্দ্র করে যে অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল রাভা সাহিত্যে তারই পরিণত রূপ চাম্পাই উত্তর রাভা সাহিত্য। আজও 'চাম্পাই'-এর প্রভাব অব্যাহত।

সাময়িক পত্র নতুন লেখকদের অনুপ্রেরণা দেয়। সাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদিকে তার পৃষ্ঠায় একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট করে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক মূলত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এইক্ষেত্রে রাভা সাহিত্য পত্রিকা 'চাম্পাই'-এর ভূমিকা ব্যতিক্রমী নয়। অনেক রাভা সাহিত্যিক চাম্পাই-এর মাধ্যমেই পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছেন, সমাদৃত হয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে সাহিত্য জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছেন, পাশাপাশি রাভা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীমন্তকুমার জানা : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ ঃ প্রথম পর্ব) প্রথম প্রকাশ ২০০২, জুলাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০১

২. মালিনী দেবী রাভা : 'রাভা সাহিত্যর বুরঞ্জী' (প্রথম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫

৩. তদেব ঃ পৃষ্ঠা-৫৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. উপেন রাভা : রাভা ভাষা আরু সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

২. চারুমোহন রাভা : রাভা সংস্কৃতির চমু পরিচয়, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৩. দেবেশকুমার আচার্য : প্রবন্ধ বিচিত্রা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৪. বীরেন রাভা : রাভা জনজাতির চমু আভাস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৫. মালিনী দেবী : রাভা সাহিত্যর বুরঞ্জী, প্রথম খণ্ড, ২০০২

৬. মালিনী দেবী : অসমীয়া আরু রাভা সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৭. রাজেন রাভা : রাভা জনজাতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮

৮. শ্রীমন্তকুমার জানা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০২

ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের দলিত সাহিত্য : কিছু কথা

অনামিকা চক্রবর্তী

ভারতীয় সমাজের ব্যাপকতর পরিধি জুড়ে রয়েছে সমাজের অধঃস্তন শ্রেণির মানুষ। বর্ণ-বর্গ শ্রেণিবিভক্ত সমাজ তাদের কোনোদিনই 'আপন' বলে মেনে নেয়নি। বৃহত্তর সমাজে তাই তাদের বলা হয় 'অচ্ছুৎ' বা 'অস্পৃশ্য' সমাজ। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই অস্পৃশ্য সমাজকে 'হরিজন' অর্থাৎ হরির জন বা নারায়ণের অবতার, প্রিয় মানুষ বলে সম্মানিত করেছিলেন। মধ্যযুগের যুগনায়ক শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম জনজাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর ব্যতিক্রমী মন্ত্রে, 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণা'; জীবনের প্রান্তসীমায় পড়ে থাকে যে চণ্ডাল তাকে তিনি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ মানবের সম্মান।

১৯৭২ সালে জে মাইকেল মহারের সম্পাদনায় 'The Untouchables in Contemporary India' বইটি প্রকাশিত হয় University of Arijona Press থেকে। এর অনেক আগে থেকেই সংগ্রামের শুরু হয়েছে সমাজ ও সাহিত্যে, ক্রমে তা প্রকাশিত হতে থাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সমাজের যে-অংশের মানুষ শোষিত ও সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকেই বলা হয় দলিত শ্রেণি। দলিত সাহিত্যিক হিসেবে প্রসিদ্ধ অর্জুন ভাঙলে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন,

> দলিত কথাটার মানে হচ্ছে ধর্মের নামে ও অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ। দলিত লেখকরা আশা করেন এই শোষিত জনগণ এই দেশে একদিন বিপ্লব করবেন।[১]

দলিত সাহিত্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়,

> Dalit literature is not a just literary event. It is the outcome of social injustice mated out to a class which has not remained what it was for the ages. A class of impatient and articulate young men are at the centre of this movement.[২]

দলিত সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা এভাবে প্রণালিবদ্ধ করতে পারি—

এক দলিত সাহিত্য দলিত জীবনের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর। লেখকের

চক্রবর্তী, অনামিকা : *ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের দলিত সাহিত্য : কিছু কথা*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৫২-৫৯

আত্মজীবনীতে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও শোষণ এবং নির্যাতিতের প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা সমাজবাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দুই দলিত জীবনের নিজস্বতার বোধ। শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া ও মানুষকে মুক্ত করার আহ্বান দলিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিন নিজের জীবনকে নথিবদ্ধ করার দায়িত্ব বড় হয়ে ওঠে দলিত সাহিত্যে। জীবনযাপনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সারাৎসার সাহিত্যে উঠে আসে।

চার দলিত সাহিত্য বিরোধ ও প্রতিবাদধর্মী এবং আন্দোলনমুখী।

পাঁচ দলিত সাহিত্যের উৎস মহারাষ্ট্র হলেও, এর মননশীল আবেগ অপরাপর ভাষার সাহিত্যেও ক্রমবিস্তারিত হয়েছে।

ছয় প্রকরণের দিক থেকে দলিত সাহিত্য স্বাতন্ত্র্যধর্মী। কথাকাররা আত্মজীবনী ও স্মৃতিমূলক রচনাকে আখ্যানের মর্যাদা দিয়েছেন।

সাত দীর্ঘদিনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত আরোপিত ঔচিত্যবোধ, নৈতিকতার শিকল থেকে মানুষকে মুক্ত করে তার জীবনের সম্পূর্ণটুকু ফুটিয়ে তোলা দলিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আট দলিত সাহিত্য স্বভাবগত দিক থেকে পর্যবেক্ষণশীল। সমাজ পরিপার্শ্ব ও মানবজীবনকে দেখার ধরন অনেকটাই তির্যক।

নয় দলিত সাহিত্যে নিরাবেগ বাস্তবতা, সামাজিক চোরাঢেউ ও অনিবার্য ভাঙনের কথা বড় হয়ে ওঠে।

দশ নিরাশ্রয়তাবোধ ও আশ্রয় সন্ধানের জন্য আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনেই দলিত সাহিত্যের জন্ম।

এগারো দলিত সাহিত্যে মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায়, সে সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রো সাহিত্যের প্রভাবের প্রতিফলন প্রকাশ পায়।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে মানুষের মনে জেগে উঠে শিক্ষালাভের স্পৃহা, ক্রমে গ্রাম ভেঙে নগরায়ণের ফলে গড়ে ওঠে বর্তমান সভ্যতা— যা মানুষকে দিয়েছে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার ঠিকানা। নিজেদের জীবনযাপন অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে মানুষ। দলিত শ্রেণির মধ্যে জন্ম নেয় আত্মোন্নতি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে জন্ম হয় দলিত সাহিত্যের। প্রথমাবস্থায় তা রাজনৈতিক প্রতিবাদের সৃষ্টি করেছিল, এই রাজনৈতিক কর্মসূচির পুরোধা ছিলেন ড. বি আর আম্বেদকর। তাঁর প্রতিবাদের কর্মসূচি দলিতদের মধ্যে, বিশেষভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক গতি তৈরি করেছিল, ফলে প্রতিবাদের ধারণা সূচিত হয় মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্যে। এর ক্রমবিস্তার ঘটে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাতি, মালয়ালম ছাড়াও অপরাপর ভাষার সাহিত্যেও। ঔরঙ্গাবাদের মিলিন্দ সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'অস্মিতা', দয়া পাওয়ারের 'প্রতিষ্ঠান', 'সত্যকথা', 'মারাঠওয়াড়া' পত্রিকা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবাদধর্মী ও আত্মসচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

ভারতীয় কথাসাহিত্যে যাঁরা সততার সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনের রূপায়ণ করেছেন তাঁদের মধ্যে দয়া পাওয়ার, বাবুরাও বাগুল, মহাদেও ধামাল, অরুণ কাম্বলে, জি ভি পওয়ার, নামদেও কাম্বলে, আন্না ভাউ সাঠে, শঙ্কররাও খরাট, জ্যোতিবা ফুলে, অর্জুন ভাঙলে অন্যতম। তাঁদের সাহিত্যে ব্যতিক্রমী চিন্তার স্ফুরণ নতুন

মাত্রায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

দলিত সাহিত্য : ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের উচ্চারণ

মারাঠি সাহিত্যের ইতিহাসে ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন যুগের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছিল। ওই দশকে শ্রমিক শ্রেণির সমস্যাবলি নিয়ে কবিতা রচনা করেন কবি নারায়ণ সুর্ভে। তাঁর 'অ্যায়সা গা মি ব্রহ্ম' ও 'মাঝে বিদ্যাপীঠ' কাব্য দুটি তরুণ মারাঠি সাহিত্যিকদের নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিল। বাবুরাও বাগুল ছিলেন এঁদের অন্যতম। তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'জিভা মি জাত চোরলি হোতি' (যখন আমি জাত লুকিয়েছিলাম) মারাঠি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল, এতে ছিল দশটি ছোটগল্প। বাগুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'মরণ স্বস্ত হোত আহে' (মরণ বড় সস্তা) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর, গল্পকার পাঠক সমাজে সম্পূর্ণভাবে দলিত সাহিত্যকে পরিচিত করিয়ে দেন। ফলে সমাজজীবনের এক কৌণিক উচ্চারণ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে উত্তরকালীন লেখক ও পাঠকদের মধ্যে। নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গি, একেই তিনি লেখার বিষয় করে তুলেছেন। বাবুরাও বাগুলের 'মা' গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন ঈশানী হাজরা ও কন্নড় কবি এল হনুমন্তাইয়ার 'মা' কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়।

বাবুরাও বাগুলের 'মা' ছোটগল্পটিতে তাঁর গভীর মননধর্মিতার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখাটিতে যে মানুষের কথা বলা হয়েছে আর যে মানব পরিস্থিতি তৈরি হয়ে উঠেছে সেই মানুষ ও পরিস্থিতি আমাদের কাছে নতুন হয়ে দেখা দেয়। কথাকারের ভাবনার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। একটি মা ও শিশুকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও দুজনের মানসিক বিবর্তনে এগিয়ে গেছে গল্পের আখ্যান। গল্পের প্রথমেই আমরা পাই দলিত শিশুদের পাঠশালা ও শিক্ষকের আবৃত্তি করা একটি কবিতা দিয়ে, ক্লাস চলছে, কবিতাটি 'মা' বিষয়ক এবং সেখানে 'মা'কে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে 'বাৎসল্য সিন্ধু' রূপে। এই উপমা নিয়ে ভাবতে শুরু করে পিতৃহীন শিশু পাণ্ডু, যার মাকে সবাই 'বেশ্যা' বলে ডাকে ও তাকে বলে 'ব্যাটা বেশ্যার দালাল'। পাণ্ডু কাঁদলে সবাই বলে : 'আরে শোনো। বেহায়া মেয়েছেলেটার বাচ্চাটা কাঁদছে'— এমনভাবে বলে যে পাণ্ডুর মুখ লজ্জায়, রাগে লাল হয়ে ওঠে।

স্কুল শেষের ঘণ্টা বাজলে দলিত ছেলেরা, 'খুব তাড়াতাড়ি তারা ফিরে গেল তাদের কিম্ভূত পুরনো স্বভাবে ঘুঁযোঘুঁষি, চিৎকার, পা টেনে টেনে হাঁটা, লড়াই আর গালিগালাজে।'[৩] ক্লাশের পড়া আর জীবনের বাস্তবতার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য, আদর্শায়িত বাস্তবের সঙ্গে ক্লেদাক্ত যন্ত্রণাময় বাস্তব যে অনেকসময়ই মেলে না তা মনের মধ্যে অনুভব করে শিশুটি। পাণ্ডুকে তার সহপাঠীরা সবসময় তাতায়, গালাগালি দেয়, তাই সে কারো সঙ্গে মিশতে চায় না, 'পাণ্ডু হাসে না কখনও, কখনও মেশে না অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে।'[৪] পাণ্ডুর জীবনের এ বাস্তব আরোপিত নয়, বাবার মৃত্যুর পর পাড়াপড়শির নোংরা পুরুষরা তার মাকে উপভোগ করতে চেয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুর মা তাদের প্রশ্রয় দেয় না। ভরণ-পোষণের জন্য সে শেষ পর্যন্ত ওভারসিয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, কেননা সে ওভারসিয়ার 'তাঁর অং এর মানুষ', সে তার মনে রং ধরিয়েছে। এই ঘটনায় আরো খেপে যায় পাণ্ডুর মায়ের উপর অন্যরা, পাণ্ডুর মাকে কিছু করতে পারে না, যত রাগ আর তাচ্ছিল্য গিয়ে পড়ে এই নাবালকের উপর। পাণ্ডুর মা সকালে বেরিয়ে যায়, আর ফেরে রাতে, এ নিয়ে স্কুলে সব বাচ্চারা বাজে-নোংরা কথা বলে, তার পাশের ঘরের ছেলে কিষান নিষ্ঠুর গলায় সব ছেলেদের বলে, 'কেউ তোরা পাণ্ডুকে ছুঁবি না। আমার মা বলেছে ওর মা নাকি এইভাবে ওভারসিয়ারের সঙ্গে শুয়ে থাকে...।'[৫] তার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিতে ক্লাসের সমস্ত ছেলেরা হেসে ওঠে।

ছোট পাণ্ডুর মনে দিনে-দিনে মায়ের প্রতি জাগতে থাকে ঘৃণা, তার ব্যবহার প্রতিশোধাত্মক হয়ে ওঠে। তার মনে এ নিয়ে দুধরনের মানসিকতা কাজ করে, সে জানে এবং বোঝে, মা-ই তার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়, পাণ্ডুর ভেতরে জন্ম নেয় হিংস্র দানবীয় জিঘাংসা। পারলে সে ওদের সবাইকে খুন করে, ঠান্ডা মাথায়।... তার ভীষণ কান্না পায়, কিন্তু ভয়ও হয় কান্নার আওয়াজ শুনে রাস্তার অন্য মেয়েরা যদি ভাবে কী ব্যাপার তারা তো এদিকে চলে আসবে কী হল দেখতে, তারপর তার সামনে মাকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করবে। মা সামনে নেই, ও তো শুনতে পাবে না, মাকে এভাবে গালি দিলে পাণ্ডুর একটুও ভালো লাগে না,

> সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কান্না চাপাবার, কিন্তু পারছে কই? আর সেই সঙ্গে, আকুল হয়ে মনে মনে মিনতি করে চলেছে যাতে মা ফিরে আসে।[৬]

তার মনে ত্রাস মাকে যেন কেউ গালাগাল না করে, যেভাবে মা তার একমাত্র আশ্রয়, সেভাবে সে-ও মার একমাত্র আশ্রয়।

পাণ্ডু দোলায়িত মানসিকতায় মায়ের সমস্ত আচরণ ব্যাখ্যা করে চলে,

> ... আমার মা সত্যিই বদলে যাচ্ছে, আর যেন সেই আগের মতো নেই। কাল রাতে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম মা ফিরবে বলে, ঠিক সময়ে ফিরলই না। কত, কত দেরি করে এল আর যখন বা এল আমার সঙ্গে একটা কথা বলা তো দূরের কথা একটা চুমু পর্যন্ত খেল না।[৭]

এভাবে মা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়, মায়ের প্রতিটি কাজ সে সন্দেহের চোখে দেখে, আর ছোট্ট বুকে যেন পাথরের ভারী বোঝা রাখা আছে। তার বাবার মৃত্যুর পর ওভারসিয়ারের সঙ্গে মায়ের মেলামেশা সে মেনে নিতে পারে না, আর একদিকে পাড়ার মানুষ তাকে ও মাকে কুৎসিত গালাগাল দেয়। স্কুলের শিক্ষক 'মা'কে যে 'বাৎসল্য সিন্ধু'র উপমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তা পাণ্ডু নিজের মায়ের মধ্যে খুঁজতে গিয়েও হারিয়ে ফেলে।

কন্নড় কবি এল হনুমন্তাইয়া তাঁর 'মা' কবিতায় এঁকেছেন সেই মা-কে, স্বামীর ভুলের খেসারত দিতে দিতে বয়সের ভারে যার নুয়ে আসে কাঁধ, 'বাবার ভুলের খেসারত দিতে/ঘি বিক্রি করে পয়সা মানত করেছ/জীবনচক্রের চাকা কাদায় বসে যাবার পর/মাথা রাখার জন্য তোমার কাঁধও এখন জীর্ণ।'[৮]

সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা চায় সন্তান যেন 'দুধে ভাতে' থাকে, অন্নবস্ত্রের কোনো কষ্ট যেন না পায়, স্বাবলম্বী হতে পারে, তাই সন্তান শিক্ষিত হয়ে 'মানুষ' হয়ে উঠুক। এই 'মা'ও সন্তানের হাতে তুলে দেয় বই, সে যেন পাঠশালায় যায়, তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে মা সন্তানের ফিরে আসার পথের দিকে তাকিয়ে — 'বইগুলো আমার বগলে দিয়ে/পাশের গ্রামে যাওয়ার পায়ে চলা পথে এগিয়ে দিয়ে/ তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে/ তোমার চোখে জল আসত আনন্দে...'[৯] যে মা শয়তানের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য হাঁড়ির কাজল লাগিয়ে দিত সন্তানের কপালে, সেই সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে 'মায়ের' মন পথ চলে আনমনে। এ কবিতায় কবি নিজেকেই যেন খুঁজে চলেছেন,

> In fact, he was engaged in the quest of his own identity, and was not writing for a reader at all. The reader was no longer to look for logical development in a work of literature but to endeavour to comprehend a total experience.[১০]

বাবুরাও বাগুলের 'মা'ও চেয়েছে সন্তানের সুরক্ষা ও একমুষ্টি আহার, তাই সমস্ত দুঃখ নিজে মাথা পেতে নিয়ে সে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেছে, সন্তানের জন্য সমস্ত কষ্ট, লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়েছে কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি, তার স্বগতোক্তি লক্ষণীয়, নিঃশব্দে সে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে আর ভাবছে,

> 'খোকা, আমাকে বেশ্যা বলে তুই চলে গেলি। তোর বাবা আমাকে যত না দুঃখ দিয়েছে, তুই দিলি তার চেয়েও অনেক বেশি। এইজন্যই কি ভগবান আমার কোলে তোকে পাঠিয়েছিলেন? তোরা সবাই আমায় যন্ত্রণা দিয়েছিস— তুই, তোর বাবা, পথের মানুষগুলো— এমনকি মেয়েরাও। তোর জন্য আমি নরক মাড়িয়ে গিয়েছি দুপায়ে। তুই কি কিছু জানিস খোকা?... ইচ্ছে করলেই খুশিতে গা ভাসিয়ে থাকতে পারতাম কিন্তু সব ছেড়েছিলাম খোকা, তোর জন্য তোর জন্যই বেঁচেছিলাম, ভেবেছিলাম বড় হয়ে আমার সহায় হবি কিন্তু তুইও আমায় ঠকালি...।'[১১]

এ শুধু একটি নারীর আত্মবিলাপ নয়, যে কোনো নারীকে কেন্দ্র করে শরীরী চাহিদার যে প্রলোভিত বাস্তবের সৃষ্টি হয় তার এক চিরন্তন রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে ওভারসিয়ারের জৈবিক ক্ষুধা, অপরদিকে মায়ের মনের মাতৃত্ব-স্নেহ-মমতা। গল্পের চরমে পাণ্ডুর মা ছেলের মৃদু স্বর শুনতে পায়নি,

> সে শুনতে পেল না দরজায় মৃদু করাঘাতও আর ছেলের দ্বিধাগ্রস্ত স্বর, 'মা'!' পাণ্ডু দেখল দুজনকে, মা আর ওভারসিয়ার— গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। পাণ্ডুর মা ছেলে এসেছে বলে দরজা খুললে ওভারসিয়ারকে দেখে তার আর কিছু করার থাকে না, পুরুষের কামনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া নারীর কি কোনো পথ খোলা থাকে? মা আর ওভারসিয়ারকে দেখে পাণ্ডু রাগে দুঃখে দৌড়ে যেতে থাকে, ততক্ষণে তার নাবালক হৃদয় ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে যন্ত্রণায়-দুঃখে, সে পাগলের মতো ছুটতে থাকে। তখনই মা দেখতে পায় ছেলেকে '... পাণ্ডু দৌড়ে যাচ্ছে জোরে, আরও জোরে... আর পাণ্ডুর মা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে ওভারসিয়ারের কামনাজর্জর আশ্লেষ থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু তার মুক্তিও একেবারেই অসম্ভব, জলাভূমিতে নরম পাঁকে আটকে পড়া মানুষের মতোই।[১২]

বাবুরাও বাগুলের 'মা' আখ্যানে রূপক ও বাস্তবতা সমান্তরাল অনুপুঙ্খে বিশিষ্ট রূপলাভ করে। লেখকের সংবেদনশীলতায় দলিত জীবনের বাস্তব রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে মানবসত্য উন্মোচনের আকাঙক্ষা শিল্পসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল তা গল্পের চরমে সিদ্ধিলাভ করেছে। সাহিত্যসৃষ্টি তো সংগ্রামেরই নামান্তর যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের আত্মপরিচয় খোঁজে, দলিত সাহিত্য সেই আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেছে নিজের মতো করে।

উত্তর-পূর্বের সাহিত্যচর্চায় কিছু ভাবনা

উত্তর-পূর্বের সাহিত্যভাবনায় 'দলিত সাহিত্য' বলে নির্দিষ্ট কোনো ধারাস্রোত আমরা পাই না, তবে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদধর্মিতা দলিত সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তা নিম্নবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। উত্তর-পূর্বের সাহিত্যসৃষ্টিতে নিম্নবিত্ত জীবনযাপনের যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় সেখানেও সামাজিক অভিঘাত পাঠকের অনুভবী মনে নতুন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। লেখকের আন্তরিকতা ও আবেগ পাঠকের অনুভূতি ও মানসিকতায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে উপলব্ধির আলোকে নতুন হয়ে ওঠে। নব্বই দশকের অসমিয়া সাহিত্যিক ইমরান হুসেইন একজন ব্যতিক্রমী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সূচনার সময় থেকেই তিনি স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। তাঁর 'বাক', 'হুদুমদেউ' গল্পে তিনি লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকবাস্তবকে বিশ্লেষণ করেছেন মানবিক সংবেদনশীলতায়, গ্রামীণ জনজীবনের বাস্তবতার নিখুঁত ছবি তাঁর গল্পে উপলব্ধির গভীরতায় পৌঁছে যায়। ইমরান হুসেইনের 'যাত্রা' ছোটগল্পটি নিম্নবিত্ত জীবন সংগ্রামের দলিল হয়ে ওঠে, এতে রাবেয়া ও দুলালি নামের দুটি মেয়ের কথা বলা হয়েছে। মেয়েরা বনজঙ্গল থেকে কাঠখড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি করে। দুঃস্থ দুলালিকে এক বুড়ো বিয়ে করতে চায়। দুলালির অর্থলোভী পিতা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় পণের লোভে, কিন্তু দুলালি রাজি হয় না বলে, কাঠখড়ি বেচতে আসা দুলালিকে বাজারে সবার

সামনে সেই বুড়ো অপমান করেছে। এতে তার বান্ধবী রাবেয়া প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, কিন্তু শান্তশিষ্ট দুলালি তাকে বাধা দেয়, রাবেয়ার তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে দুলালির উত্তর,

> মনের মতন মানুষ পাইলে বিয়ে বসিম, না হইলে থাকিম এমনে। খড়ি বেচে খাইম। তোর সাথে কয়েক দিন আসা যাওয়া কইরলে পরে একলাই বেইচপার পাইম।[১৩]

রাবেয়া জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা জানে, সে অনেকদিন ধরে বাজারে খড়ি বেচতে আসে, সহজ-সরল দুলালিকে বাজারে অপমান করে বুড়ো, যাতে খড়ি বিক্রি করে দুলালি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে না পারে। বুড়ো বাধা দেয় দুলালিকে, তাকে পরাধীন করে নিজের আয়ত্তাধীন রাখতে চায়। রাবেয়া সমাজের নিষ্ঠুরতাকে জানে বলেই বলে, খড়ি বেচা এত সহজ কাজ নয়, শক্ত মনে ঠিক জবাব দিতে হবে। তাকে পরীক্ষা করার জন্য রাবেয়া উত্যক্ত করা একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলে, তাকে উপযুক্ত গালি দিয়ে দেখা এই বিকিকিনির বাজারে নিজেকে ঠিক রাখতে পারবি কি না, এতে দুলালির যে প্রতিক্রিয়া, তা লক্ষণীয়,

> এক মুহূর্ত দেরি না করে রাত্রির নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এবং জমাট কুয়াশাকে ছিন্ন করে দুলালি চিৎকার করে উঠল, 'ওই জারুরে গোলাম। তোক যদি আরো এই পাকে দেখং খড়ি দিয়া চাপার দাঁত খসাইম... ওই নটীর বাচ্ছা...।' রাবেয়া অবাক হয়ে দুলালির মুখের দিকে তাকাল। অদৃশ্যপূর্ব, পাথরে খোদাই করা একটি রুক্ষ মুখ দেখে সে চমকে উঠল।[১৪]

দলিত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল, সমাজের যে শ্রেণিকে দলিত করে রাখা হয়েছে তাদের জীবনের কথায় দিতে হবে বৃহত্তর সাহিত্যের সমধর্মী ব্যঞ্জনার প্রকাশ। তাই দলিত সাহিত্যের রয়েছে এক বিপুল বিস্তার, সমস্যা-সংঘাতের বাচনিক রূপায়ণ, তাই 'দলিত' শব্দটির মধ্যে রয়েছে জীবনের নানা তরঙ্গ। আর সেই তরঙ্গগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রেখায় আমরা বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। সব সুরই এক, রৈখিক প্রকাশ তার বিচিত্র হলেও সবই জীবনের অণুবিশ্ব। প্রকৃত বাস্তবতা আর আরোপিত বাস্তবতার পার্থক্য সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে যুদ্ধোত্তর অসমিয়া সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'তিনিচকীয়া গাড়ী'র জজ জাবিদের উল্লেখযোগ্য মন্তব্যে,

> এজলাছৰ যিবোৰ ঘটনা হাজিৰ কৰা হয়, সেইবোৰ বিচিত্ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু অবিকৃত নহয়। মোকৰ্দমা জিকাৰ উদ্দেশ্যে দুয়ো পক্ষই ডাল-পাত জোৰা দি প্ৰকৃত ঘটনাটোক আইনৰ ধাৰাত পেলাবৰ উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তোলে। আচলতে মোকৰ্দমাৰ কাহিনীবোৰ উকীলৰ সৃষ্টি, আচল কাহিনীৰপৰা সি বহুত বেলেগ। ... সকলো ঘটনা ৰহস্যজনক নহয়, কিন্তু এজলাছৰ বাহিৰত কিছুমান ঘটনা ঘটে, যিবোৰ অতি বিচিত্ৰ, বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা।[১৫]

সাধারণ তিনচাকার ঠেলাগাড়িতে করে মশলা বিক্রি করা বাবার ছেলে জাবিদ আজ কাছারির জজ। তার জীবনের ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে গল্পের আঙ্গিক গড়ে উঠেছে, পরিস্থিতির বাস্তবতা ও চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষণে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে সৎ-উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠায় মানুষ কত মহৎ হতে পারে, প্রকাশের গুণে গল্পটি নান্দনিক ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অসমের অন্যতম কথাশিল্পী কুমার অজিত দত্তের 'কলাবতীর বারমাস্যা' গল্পটি আমাদের নিয়ে চলে এমন এক জীবনের বৃত্তান্তে যেখানে এক খোঁড়া বাবা ও কন্যা কলাবতী, ব্যস্ত শহরের ফ্লাইওভারের সাবওয়েতে ভিখারিদের সঙ্গে থাকে। প্রত্যেকের জীবিকার উপায় ভিক্ষাবৃত্তি, কেউ খোঁড়া, কেউ বোবা-কালা, অসুস্থ। তীব্র অনাহারের শিকার হয় খরার সময় গ্রামের মানুষ। সেই থেকে তারা ঠিকানাহীন উদ্‌বাস্তু। যারা শহরকে দূর থেকে ভেবেছিল 'সব পেয়েছির দেশ', শহরে এসে তারাই হয়ে ওঠে ভিখারি। দুটি পা পঙ্গু, লাঠি নিয়ে কোনোমতে ঠক্ ঠক্ করে চলে বাবা, কলাবতী ফুটপাতে বসে ভিক্ষা করে,

উলটোদিকে বসে থাকে বাবা— হঠাৎ দেখে বাবার মুখ থেকে জিহ্বা বেরিয়ে এসে এক পাশে পড়ে আছে আর সেই জিহ্বা চাটছে একটি পথের কুকুর। ভিক্ষার জায়গা চলে যাবে বলে কলাবতীর একাকী মন ভেঙে গেলেও সে 'মরা-বাবা'র কাছে যেতে পারেনি। কিছু সময় পরে মিউনিসিপ্যালিটির ভ্যান এসে মরা কুকুরের মতো বাঁশে করে হাত-পা বেঁধে কলাবতীর বাবাকে নিয়ে যায়। একসময় যে স্বপ্নময় চোখ নিয়ে শহরে এসেছিল এই তার চরম গতি। কলাবতীর মনে, 'বাপটা মনের মধ্যে আহে আর যায়।... এ পিথিবিতে আমার খুজ লাওনের আর তো কেউ লাই।'[১৬]

ভিখারিণী কলাবতীর জীবনে বাবার মৃত্যুর দিনেই হয় সবথেকে বেশি উপার্জন। এক চকচকে জুতো পায়ে, গায়ে ফিনফিনে শার্ট আর লাল জ্যাকেট চশমার কালো চোখ শহুরে বাবু, তার ক্ষুধাক্লিষ্ট ভিখারিণী ফোটো তুলে নিয়ে তাকে দেয় একশো টাকার নোট। ক্যামেরাম্যানের নিপুণ কারসাজিতে কলাবতী আজ 'ফর সেল', ফোটোর কভারেজ দেওয়া হয়েছে, 'আর্ট অফ হাঙ্গার'। সেদিন রাতেই শহরের ধোপদুরস্ত রূপ ফিরিয়ে আনার জন্য সাবওয়ের সব ঝুপড়ি ভেঙে ফেলে পুলিশ। হতভাগ্য মানুষ হতচ্ছিন্ন অবস্থায় আবার দৌড়তে থাকে আশ্রয়ের সন্ধানে আর অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুধাক্লিষ্ট ভিখারির ফোটো সন্ধানে থাকা শিল্পীর বাদামি দুচোখে ফুটে ওঠে 'খুশি আর তৃপ্তির প্রশান্তি'। কলাবতীর মুখে তো সেদিন শুধু ক্ষুধার ক্লিষ্টতা ছিল না, সে সঙ্গে পিতৃহীন, অবলম্বনহীন এক কন্যার কান্নাও যে মিশে গিয়েছিল। 'ইয়ে শহর সাফ রাখনা হোগা'র ত্রাতা পুলিশের মার গিয়ে পড়ে ভিখারিদের হাড্ডিসার পিঠে, মূল্যহীন-নিঃস্ব জীবনের প্রতিচ্ছবিতে এ গল্প যেন আমাদের মানসিকতার এক ভাঙাচোরা দর্পণ।

ত্রিপুরার অন্যতম শক্তিশালী লেখক বিমল সিংহের 'গোলাপের ছেলেবেলা' ছোটগল্পটি তাঁর মননশীলতার ব্যাপ্তিকে চিনিয়ে দেয়। গোলাপ চা-বাগানের কুলির সন্তান, ঘুম থেকে উঠে মা-বাবারা চলে যায় চা-বাগানের কাজে, সে থাকে দিদির কোলে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তাকে খেতে দেয় চায়ের লিকারে নুন দিয়ে আর ভাতের মাড়। ছোট থেকে সে খুঁজেছে ভগবানকে, যে তাদের ভাগ্যে তিনবেলা ভাত লিখে দেয়নি। চা-বাগানের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'র সবুজ শ্যামলিমাময় পরিবেশে নৃত্যরত নর-নারীদের যে বিজ্ঞাপিত ছবি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা নিয়ে দেখা দেয় তার বাস্তব ছবির এক শক্তিশালী প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পকার বিমল সিংহ। গোলাপ জেনেছিল তার বাবার মুখে 'বাবুজাত' বলে একধরনের শ্রেষ্ঠ জাত আছে, আর ওরা 'পরজাত'— দুটো জাতের মানুষ দেখেই বোঝা যায় এরা আলাদা। একসময় মানুষ সমাজ গড়েছে, পরে সমাজ গড়েছে মানুষকে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে মানুষের চলার পথ। জীবনের এই ফারাক তৈরি করেছেন ভগবান, তাই সে তার বাবাকে বলে ভগবানকে পেলে যেন তাদের চাল বেশি করে দিতে বলে, গোলাপ তাহলে খেতে পাবে পেটভরা ভাত। ছোটোবোন শিবদাসীয়ার জন্মের সময় সে দরজায় বসে থেকেছে ভগবানের কাছে ভাতের প্রার্থনা জানাবে বলে, কিন্তু ভগবানকে খুঁজে পায়নি। আজ গোলাপ নির্মম বাস্তব সত্য জেনেছে সঠিক অর্থেই,

> কেঁদে হাত পা ছুঁড়ছিল। বুঝলাম, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার জন্য দুটি কচি হাত এল অগণিত আধ পেটা মানুষের পৃথিবীতে।[১৭]

গল্পের সমাপ্তিতে সূচনা হয় জীবন সংগ্রামের— গোলাপ, শিবদাসীয়ার মতো অন্যরাও।

ত্রিপুরার অপর আর একজন গল্পব্যক্তিত্ব সন্তোষ রায়— তাঁর 'এঁটো' গল্পটি দেশভাগের রক্তাক্ত বিষে ঘরবাড়ি হারিয়ে কিরণলতা ও রাণী, মা ও মেয়ে আজ উদ্‌বাস্তু, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এপথ থেকে ওপথে। একটু আশ্রয়, আজও কিরণের চোখে ভাসে সেই হাহাকারগ্রস্ত রাতের বীভৎস ছবি,

> মাঠের ওপর দেশপালানো দৌড়। চিৎকার। দৌড়। আগুনের হল্কা। দৌড়। শরীর ঘেঁষে

একটা শরীর খসে পড়ে ধানক্ষেতে, চিৎকার। কাঁপতে কাঁপতে ধানগাছগুলো নিথর হয়ে যায়।
আর কিছু দেখতে পায় না কিরণ। দৌড়-দৌড়।[১৮]

একমাত্র কন্যাকে বুকে নিয়ে হাঁটুগেড়ে ধানখেতের মধ্যে চুপচাপ পড়ে থাকে কিরণ, জীবনকে বাঁচাতে এই যে চলা, মানুষের পৃথিবীতে মানুষের যে তাড়না তা সত্য অর্থেই ধিক্কার আনে মনে, মানবিক রসায়নে যুক্ত করে দেয় স্বতন্ত্র মাত্রা।

প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদকে পেতে চায় সাহিত্যে, তাই শিল্পীরা এমন এক ভারতবর্ষের সন্ধান করেছেন যেখানে প্রতিটি মানুষ পায় সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বেঁচে থাকার আশ্বাস। জীবনবোধের জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে বিরোধ করে করে মানুষের যে মানসিক বিবর্তন ঘটে, এই রূপান্তরকেই দেখান একজন যথার্থ শিল্পী।

তথ্যসূত্র

১. রায় দেবেশ (সম্পা), দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা-৫৪, ২০১১, পৃ-৬৫।
২. Datta, Amaresh (Ed.) Encyclopedia of Indian Literature, Vol. 1, Sahitya Akademi, Delhi, 2003, P 839.
৩. রায় দেবেশ (সম্পা), দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা-৫৪, ২০১১, পৃ-১০৩।
৪. ওই, পৃ-১০৩।
৫. ওই, পৃ-১০৩।
৬. ওই, পৃ-১০৪।
৭. ওই, পৃ-১০৪।
৮. ওই, পৃ-২০৭।
৯. ওই, পৃ-২০৮।
১০. Datta, Amaresh (Ed.) Encyclopedia of Indian Literature, Vol. 1, Sahitya Akademi, Delhi, 2003, P 2381.
১১. রায় দেবেশ (সম্পা), দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা-৫৪, ২০১১, পৃ-১১১।
১২. ওই, পৃ-২০৮।
১৩. ইমরান হুসেইন, অরিন্দম বরকটকী (সম্পা), সমসাময়িক অসমিয়া গল্প, পৃ-১৪৫।
১৪. ওই, পৃ-১৪৫।
১৫. নেওগ ড. মহেশ্বর (সম্পা), অসমীয়া গল্পগুচ্ছ, অসম সাহিত্য সভা, যোরহাট, ১৯৯৭, আসাম, পৃ-১১৯।
১৬. ভট্টাচার্য অনুপ (সম্পা), উত্তর পূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প, অক্ষর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০১, পৃ-৯৩।
১৭. ওই, পৃ-১৬৭।
১৮. ওই, পৃ-২৩৬।

অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা, নারীর Identity Crisis এবং বনফুলের ছোটগল্প : একটি অনুসন্ধান

জাহ্নবী দাশ

নারী পুরুষের যৌথ অবদানে তৈরি হয় সমাজ মানসিকতা। কিন্তু মানুষ্যত্বের মাপকাঠি নারীর ক্ষেত্রে তেমন নয়, যেমন পুরুষের বেলায়। ঘরে বাইরে নারীর অবস্থান আজও দোদুল্যমান। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির উন্নয়ন নারীর পরিচিতিকে আজও উন্নীত করতে পারেনি ব্যক্তিপর্যায়ে। পারিবারিক পোশাকি ধরনে ঝালে ঝোলে অম্বলে নিজেকে উপাদেয় করে উপস্থাপিত করবে নারী এটাই তো প্রত্যাশিত সমাজের কাছে। তাই নারী যেমন নিঃসঙ্গ তার চলার পথও তেমনই দোসরবিহীন। হ্যাঁ আজও। সীমাবদ্ধতায় নিজেকে আটকে রেখে নারী ক্রমশ স্বকীয়তা হারায়, নারীত্ব হারায়। তখনই সংকীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে সংসার মনে করে। কিন্তু তার পরিসর বড় কম আর তাতে মগ্ন হওয়াও যায় না। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী বরাবরই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আমাদের সে কথাই বলে। তাই 'পূর্জাহাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ' বলে কালিদাস স্ত্রীজাতির যত প্রশংসা করুন না কেন, পুরুষ শাসিত সমাজে নারী লতাধর্মীই। পুরুষবৃক্ষকে স্ত্রীলতা বেষ্টন করে থাকবে সমাজ তাই চায়। প্রাচীন ভারতে পুরষসর্বস্ব পরিসরে নারীর আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রামায়ণে লঙ্কাযুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসার পর অপেক্ষারত সীতাকে চরম অপমান করেছেন রাম, 'নোৎসাহে পরিভোগায়'। অর্থাৎ তোমাকে ভোগ করার কোনো উৎসাহ আমার আর নেই। এমনকি যে যুধিষ্ঠিরকে আমরা ধর্মপুত্র বলে মেনে নিচ্ছি তিনি পর্যন্ত দ্রৌপদীর সাহসিকতায় ততটা আনন্দিত নন, যতটা মুগ্ধ তাঁর রূপসৌন্দর্যে। লক্ষণীয় যে সংস্কৃত ভাষায় ভৃত্য এবং ভার্যা একই ধাতুরূপ থেকে এসেছে। ভৃ ধাতু অর্থাৎ ভরণ পোষণ করা। স্বয়ং আরিস্ততল পর্যন্ত মনে করতেন, নারী হচ্ছে অসম্পূর্ণ পুরুষ। তাই 'A Room of One's Own' বা 'The Second Sex' নিয়ে আমরা যতই বড় বড় বুলি আওড়াই না কেন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান মূলত একই। নারীর অস্তিত্বহীনতার সংকট তখনও ছিল। আজও আছে। ঘরে বাইরে কোথাও সে নিরাপদ নয়।

দাশ, জাহ্নবী : *অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা, নারীর Identity Crisis এবং বনফুলের ছোটগল্প : একটি অনুসন্ধান*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৬০-৬৬

নারী মুক্তি ছিল উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের এক প্রধান উপকরণ। মূল্যবোধের বিনষ্টি, চারিত্রিক অধঃপতন, শৌখিন যুগ যন্ত্রণার ভণ্ডামি, নারী স্বাধীনতা, সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা গল্প তখন দিশেহারা। ইচ্ছে করেই কিন্তু বনফুল সে পথে হাঁটেননি। সময় সচেতন লেখক কাহিনির ঘন বুনট রচনা করেছেন ইনটেলেকচুয়্যাল উপাদান দিয়ে। সমকালীন অজস্র ভাঙাচোরা অবিশ্বাসকে তিনি সাহিত্যে সরাসরি তুলে ধরতে চাননি। তাই আমরা মারাত্মক ভুল করব যদি বনফুলের গল্পে 'আমার মেয়েবেলা', 'উতল হাওয়া' কিংবা 'দ্বিখণ্ডিত' খুঁজতে যাই। প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে নারীবাদ বলি, নারীদরদি বনফুলের নারীভাবনা তার থেকে অনেকটাই আলাদা। পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিলেই নারীদের সমান অধিকার চলে আসবে এ-কথা তিনি কখনো বলেননি। নারীমুক্তির অর্থ শুধু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা নয়, নারীর নিজের অন্তরের অবরোধ থেকেও মুক্তি। তিনি মনে করেন ব্যক্তিস্বরূপের উপলব্ধিতেই লুকিয়ে আছে নারীমুক্তির চেতনা। 'নিমগাছ', 'তিলোত্তমা', 'অমলা', 'পরিবর্তন' ইত্যাদি গল্পে আমরা তারই অনুসন্ধান করব।

আমাদের প্রথম আলোচ্য গল্প 'নিমগাছ'। ছোটগল্পের প্রচলিত আঙ্গিকে 'নিমগাছ' গল্পটি গঠিত নয়। আসলে সমকালের প্রচলিত চিন্তাধারা তথা দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অনেকটাই আলাদা ছিল বনফুলের সাহিত্যিক মেজাজ। আবেগের বাড়াবাড়ি তাঁর কোনোদিনই ছিল না। পেশাগত জীবনে ডাক্তার ছিলেন বলেই হয়তো একটা বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন ছিল তাঁর স্বাভাবিকভাবেই। কোথায় কতটুকু দেখাতে হয়, কোথায় রাশ টানতে হয় জানতেন তিনি। সুনির্বাচিত শব্দের বর্ণনাও যে ডিটেলিং-এর কাজ করে এ কথা আমাদের জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সম্ভবত বনফুলই ছিলেন এর পূর্বসূরী। 'নিমগাছ' গল্পে শুরু থেকেই লেখক একটা অবহেলিত অপাঙক্তেয় নিমগাছকে আমরা কতরকমভাবে ব্যবহার করি তার বর্ণনা দিয়েছেন। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সে বর্ণনা, "কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ বা ভাজছে তেলে। খোস, দাদ, হাজা, চুলকুনিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই...।"[১] অথচ গল্পের শেষে এসে পাঠক মাত্রেই নাড়া খায়। যখন দেখি মানবজীবনের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে কী ভীষণ সচেতন বনফুল, "ওদের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার একই দশা।"[২]

ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সর্বংসহা রূপে দেখতেই অভ্যস্ত। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা থেকে শুরু করে ভারতীয় সাহিত্যে এই রূপ নতুন নয়। আবার প্রতিবাদী নারীর সংখ্যাও প্রচুর। 'নিমগাছ' গল্পের গৃহবধূ এদের দলভুক্ত নয়। সে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ। আর রক্তমাংসের মানুষ বলেই কবির মুগ্ধদৃষ্টির কাছে তার ধরা দিতে ইচ্ছে করে। নিজের ভালোলাগাকে মনে মনে সে স্বীকৃতি দিতে চায় যখন সে দেখে একটা নতুন ধরনের লোক, "মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।"[৩] তার ইচ্ছে হল, ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে হল লোকটির সঙ্গে চলে যাওয়ার। কিন্তু তা কী করে সম্ভব। মেয়েদের আবার চাওয়া-পাওয়া। সমাজসংস্কারকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বকে বড় করে দেখতে শেখেনি আমাদের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা। গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠার সাধনায় নারীত্বের চরম সিদ্ধি— এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে ভারতীয় সমাজে। স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি 'নিমগাছ'-এর গৃহবধূরও। কারণ "মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।"[৪] এই শিকড় আসলে আমাদের আজন্মলালিত সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটা মর্মান্তিক বেদনাদীর্ণ জীবনের সঙ্গে আপস করে নিয়েছে আমাদের মতো। নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য সবাই তাকে খাটিয়ে নিচ্ছে। বনফুল সরাসরি না-বললেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না তার যন্ত্রণাময় যাপনচিত্র, "কচি পাতাগুলো খায়ও

অনেকে। এমনি কাঁচাই। কিম্বা ভেজে বেগুন সহযোগে। যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার। কচি ডালগুলো ভেঙ্গে চিবোয় কত লোক— দাঁত ভালো থাকে।"[৫] অথচ সে কেমন আছে সে কী ভাবছে কেউ একটিবারও জানার প্রয়োজন মনে করেনি। একফোঁটা যত্নও করেনি কেউ। নিমগাছ যেমন আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহ করে, তেমনি বাড়ির প্রত্যেকের জীবনকে মসৃণ করে তোলার দায়িত্ব তার একার। কাকভোর থেকে মাঝরাত অবধি সে খেটে চলে— 'বাড়ির বিজ্ঞরা খুশি হন।'[৬] কিন্তু তার প্রাপ্তির ভাঁড়ারে জমা হয় শুধু যন্ত্রণা, হতাশা আর অন্ধকার, 'বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।' যাবেই-বা কোথায়? আর কার কাছে? আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা তো নিরাপদ নয় আজও। মা-বাবা উপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ধর্ম রক্ষায় ব্যস্ত। বিবাহিত জীবনে অসুখী মেয়েটা ফিরে এলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দিই এই বলে, 'ও কিছু না সব ঠিক হয়ে যাবে' অথবা 'বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িই মেয়েদের আসল স্থান।' হাজার কোটির এই দেশে কতজন অভিভাবক তার দুঃখী মেয়েটার পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন? এমন অবস্থায় কী-ই বা করার থাকে মেয়েটির। আর্থিক দিকে সবাই স্বাবলম্বী নয়। তাই এই জীবনটাকে মেনে নিতে হয়। 'The Second Sex' গ্রন্থে সিমোন দা বোভোয়া বলেছেন,

> One is not born, but rather become a woman,... it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine.[৭]

রূপে গুণে এবং পারিবারিক স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে বিয়ের বাজারে হাইপ্রোফাইল পাত্র 'তিলোত্তমা' গল্পের গোকুল। অথচ যে তিলোত্তমার সঙ্গে তার বিয়ে হল সে 'কুচ্ছিত হাদামুখো মোটা মেয়ে।'[৮] তার মুখখানা 'মুক্তকেশী বেগুনের মতো।'[৯] বধূবরণের সময় শাশুড়ির বিষোদগার— "ভীমরতি ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজপুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে।"[১০] এমনকি গোকুল যে কি না শিক্ষিত এবং শিল্পী মনের অধিকারী তার পর্যন্ত মনে হয়েছে, "একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়।"[১১] কারণ তিলোত্তমা না জানে লেখাপড়া, না জানে গানবাজনা, "তিলের মতোই কুচকুচে কালো সে দেখতে।"[১২] আর গুণ বলতে, "মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই।"[১৩] সংসারে তার এই অবস্থান সম্পর্কে এতটুকু প্রশ্নাকুল নয় তিলোত্তমা। বনফুল সোজাসুজি না বললেও তার বাপের বাড়ি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি। তাই তার নিজের মধ্যে নিজের সসংকোচ আত্মগোপন। তার মনে হয়েছে সে গোকুলের অনুপযুক্ত, "অনধিকারী হইয়াও ভাগ্যবলে এমন সুখস্বর্গে প্রবেশ করেছে।"[১৪] তাই শ্বশুর নকুল নন্দী যখন তার বাবাকে উদ্দেশ করে বলেন, "চোর-চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা"[১৫] তখনও সে নির্বিকার। এমনকি স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছে তখনও কিন্তু বিরোধিতা করেনি সে, "হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।"[১৬] গোকুল তার কষ্ট হবে কি না জানতে চাইলে সে বলেছে, "হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।"[১৭] তাই তিলোত্তমা যে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল কেউ বুঝতেই পারেনি।

গোকুলের সঙ্গে ঊষার বিয়ে পাকা হয়ে গেল। ঊষা সুন্দরী। সেতারে অমন গৌরসারেঙের আলাপ গোকুল আর কখনো শোনেনি। তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক। আর "গোকুল কূল হারাইল।"[১৮] তাই ঊষা যখন শর্ত করল, "তিলোত্তমাকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে,"[১৯] গোকুল আপত্তি করেনি। আর একটি কথা বলেনি তিলোত্তমাও। এমনকী স্বামীর আশীর্বাদের দিনেও সে তার অভ্যস্ত রুটিন থেকে সরে আসেনি, "তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।"[২০] শ্বশুরবাড়িতে চরম অনাদৃত হলেও সেখানে

টিকে থাকার জন্য সে লড়াই করেছে আপ্রাণ। কারণ সংসারে দ্বিতীয় আর কেউ নেই যে তাকে আশ্রয় দিতে পারে। সম্মান তো অনেক দূরের কথা। তাই নিজের স্বামীর আশীর্বাদের শাঁখ বাজানোর জন্য তার যখন ডাক পড়ে তখন, "শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।"[২১]

আসলে শিশুকাল থেকেই নারীর জগৎ ধমক দিয়ে ঠাসা। তাকে প্রতিপদে জানিয়ে দেয় সমাজ ; পুরুষ যা করতে পারে স্বচ্ছন্দে, সে তা করতে পারে না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে তাকে শেখানো হয়। সেই সঙ্গে শেখে দ্বিধাগ্রস্ত ও অকারণ হীনম্মন্যতার শিকার হতে। বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শেখে পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিয়ম ও সংস্কারকে। এক কথায়, 'সমস্ত যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে।'[২২] 'A Room of One's Own' গ্রন্থে ভার্জিনিয়া উলফ এই প্রসঙ্গেই জানাচ্ছেন, "পুরুষতন্ত্রের সহজ শিকার হওয়ার জন্য নারীর দায়িত্ব কম নয়। গার্হস্থ্য এবং জীবিকার ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় শিকারির সঙ্গে সহযোগিতা করে।"[২৩]

স্বপ্নে আর বাস্তবে আশা আর প্রাপ্তিতে চরম অসামঞ্জস্য নিয়েও নারী নিরন্তর বোঝাপড়া করে চলেছে তার জীবনে। নিজের স্বপ্ন আর ইচ্ছেগুলিতে দাঁড়ি টেনে চেষ্টা করেছে সুখে থাকার। এমনই একটি অণুগল্প 'অমলা'। গল্পে আমরা দেখি যখন যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাদেরই নিয়ে কখনও কল্পনায় আবার কখনও-বা প্রত্যক্ষ দর্শনে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে অমলা। প্রথম পাত্রের নাম অরুণ, "নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবি না আঁকলে। সুন্দর, সুশ্রী, যুবা— বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবি,— সুন্দর, সুপুরষ"।[২৪] সময় মতো পাত্রের হয়ে অমলাকে দেখতে এল ছোটভাই বরুণ। আড়াল থেকে তাকে দেখে মায়ায় ভরে গেল তার মনটা। সে ভাবল, "আমার ঠাকুর পো।"[২৫] অমলার আনন্দের সীমা রইল না যখন সে শুনতে পেল, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে।"[২৬] পুরো রাতটা সে কাটিয়ে দিল স্বপ্ন দেখেই। অথচ "বিয়ে কিন্তু হল না— দরে বনল না।"[২৭]

কিছুদিন পর আবার সেজেগুজে পাত্রপক্ষের কাছে পরীক্ষা দিতে বসল অমলা। এবারে পরীক্ষক স্বয়ং পাত্র হেমচন্দ্র। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ ভরে দেখল অমলা। বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা। দুধে-আলতা গায়ের রং। একমাথা কোঁকড়া চুল। সোনার চশমায় দিব্যি মানিয়েছে। অরুণকে পেছনে ফেলে এবার অমলার মন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল এই নতুন লোকটির দিকে। আবারও সে স্বপ্ন দেখল রাতভর। হেমচন্দ্রকে নিয়ে অমলা "ভাবলে— কত কি ভাবলে।"[২৮] "অথচ এবার দরে বনল— কিন্তু মেয়ে পছন্দ হল না।"[২৯]

ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ক্ষোভ বরাবরই ছিল শিল্পীমনে। কিন্তু নির্লিপ্তি যেহেতু বনফুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই কোথাও বাড়াবাড়ি নেই আবেগের। গল্পের শেষে আমরা দেখি অমলার বিয়ে হয়ে গেছে। পাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু "মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক— বি.এ পাস— সদাগরি আপিসে চাকরি করেন।"[৩০] একে নিয়ে অমলা স্বপ্ন দেখেনি একটুও। স্বপ্ন দেখার কোনো অবকাশ বিশ্বেশ্বরবাবু দিতেও পারেননি। কিন্তু এবারে "মেয়েও পছন্দ হল দরেও বনল।"[৩১] গল্পের শেষে ছোট্ট একটি পঙ্‌ক্তিতে পাঠককে আপাদশির নাড়িয়ে দিলেন বনফুল, "অমলা সুখেই আছে।"[৩২]

আসলে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতায় শতকরা নব্বইজন মেয়ের কাছে বিয়েটাই জীবনের চরম প্রাপ্তি। অমলার আবাল্য সংস্কার তাকে শিখিয়েছে যে মেনে নেওয়াটাই মেয়েদের ধর্ম। মনের মতো জীবনসঙ্গী না পেলেও, স্বপ্নগুলো চুরমার হয়ে গেলেও বিদ্রোহ সে করেনি। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি উক্তি আমাদের ভীষণ মনে পড়ে। 'প্রতিমাভঙ্গ' (তারুণ্য) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> আমাদের মেয়েরা জন্মাবধি স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে পুতুলের মতো লালন করতে শেখে যখন স্বামীপদপ্রাপ্ত মানুষটিকে পায় তখন সেই মানুষটিকে মানুষ ভাবতে পারে না।

> ভাবে সে একটি বিগ্রহ, সেই বিগ্রহটিকে অবলম্বন করে তাকে আইডিয়ার সাধনা করতে হবে।... মাটির ঢেলাকেও তারা পুরুষশ্রেষ্ঠের মতো ভালোবেসে পূজা করবে।[৩৩]

অমলা তাই নিজের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাহসই পায়নি। সুবর্ণলতার মুক্তকেশীরা ছোট্ট থেকেই আমাদের মেয়েদের শিখিয়েছেন, "বেটাছেলেদের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি। মেয়েমানুষকেই সবকিছু মেনে শুনে চলতে হয়।"[৩৪]

দাম্পত্য জীবনকে মসৃণভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যত চেষ্টাই মেয়েরা করুক না কেন, তার নিজের অবস্থান কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নয়। এমনই একটি গল্প বনফুলের 'পরিবর্ত্তন'। স্বামী হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে। স্ত্রী সরমার অক্লান্ত পতিসেবা ত্রুটিহীন। কিন্তু উত্তরোত্তর অসুখ বাড়তে লাগল। আত্মীয়স্বজনেরা একে একে আসা বন্ধ করে দিল। যক্ষ্মা ছোঁয়াচে কি না। যেদিন ডাক্তাররা পর্যন্ত আশ্বাস দেওয়া বন্ধ করলেন সেদিন এক অদ্ভুত আচরণ দেখা গেল সরমার মধ্যে। না কর্তব্যে একতিল গাফিলতিও সে করেনি। যক্ষ্মারোগী হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ সে লুকিয়ে খেয়ে ফেলে। এবং ধরা পড়ে যায় স্বামীর বন্ধুর কাছে। সে কিন্তু লজ্জা পায়নি। আমতা আমতা করে কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। স্বামীর বন্ধুর দিকে প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ নিবদ্ধ করে সরমা যুক্তি দিয়েছে, "উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলেমেয়েও একটা যদি থাকত তাহলেও বা কথা ছিল।"[৩৫] হিতাকাঙ্ক্ষী সেই বন্ধু বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্ট করলেন। কিন্তু "আনত মস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্যন্ত করিল না।"[৩৬]

এরপর কেটে গেছে প্রায় দশ বছর। মঙ্গলবারের এক সন্ধ্যায় হরিমোহনের সঙ্গে দেখা হল তার সেই বন্ধুর। হরিমোহন পুরোপুরি সুস্থ, "তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।"[৩৭] দুই বন্ধুতে অনেক দিন পর গল্প হল প্রচুর। যে যে ডাক্তারের হাতযশের ফলে আজ সে আরোগ্য লাভ করেছে, হরিমোহন তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। সুইটজারল্যান্ড যে কত সুন্দর সে কথাও বলল। উঠল না শুধু সেই সরমার কথাই যে হরিমোহনের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। আর তখনই জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল সরমা। কিন্তু এ কোন সরমা! দশ বছরে কি মানুষের এতটা পরিবর্তন হয়। হতভম্ব বন্ধুকে হরিমোহন তখন জানালেন, "তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়,— এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি.বি. হয়েছিল। ... থাকতে পারলাম না... দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে শেষে। ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে।"[৩৮] সন্তানহীনা নারী ভালোবাসার টানে নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল মুমূর্ষু স্বামীর সেবায় সর্বস্ব পণ করে। অথচ বিত্তবান জীবনলিপ্সু স্বামীর কাছে সরমার মতো স্ত্রীও শেষপর্যন্ত 'অভ্যাস' মাত্র। তাই বেঁচে থাকার জন্য যে উপকরণ চাই তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হরিমোহনের পোষায়নি। এক স্ত্রী গেলে আর এক স্ত্রী এসেছে। গল্পের শেষে বনফুল মোক্ষম আঁচড়টি দিয়েছেন হরিমোহনের শেষ মন্তব্যে। অভ্যাসের টানেই হরিমোহন এক স্ত্রীর বদলে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। একই রয়ে গেছে শুধু নামটা। কারণ "ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে।"[৩৯] পতিব্রতার এ-ও কি কম পুরস্কার!

আজ একুশ শতকে বদলে গেছে অনেককিছুই। নারী আজ আর অন্তঃপুরচারিণী নয়। ঘরে বাইরে তার পরিসর বেড়েছে অনেকখানি। তবে যা বদলায়নি তা হল নারীর নিরাপত্তাহীনতা। শুধু কুরুরাজসভায় কেন সর্বসমক্ষে আজও তাকে বিবস্ত্রা করা হয়। আর ধর্ষণ কি শুধু শরীর সাপেক্ষ! এই যে 'নিমগাছ'-এর গৃহবধূ, অমলা, তিলোত্তমা, সরমা— এরা ধর্ষিত নয়? এদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ভালোলাগা-মন্দলাগা, এমনকি বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকে কেড়ে নেয়নি সমাজ! প্রশ্ন উঠতেই পারে এরা তবে বিদ্রোহ করল না কেন। আমরা

ভুলে যাই পৃথিবীতে সমস্ত কিছুরই একটা ভিত্তিভূমি চাই— বিদ্রোহেরও। যে সমাজে জন্মাবধি মেয়েরা নিজেদের যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে মেনে নিতে শিখে আসছে, সেখানে বিরুদ্ধ মানসিকতা জন্ম নেওয়াটাই তো কষ্টকর। বাড়ির আসল জিনিস, তার ভিত। সেটা যদি মজবুত হয় তাহলে বাইরে ঝাঁ চকচকে রঙের প্রলেপ না-দিলেও চলে। কথাটা কিন্তু আমাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। নারী তো শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়। তার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই বোধটা আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। আর "স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকে।"[৪০]

তথ্যসূত্র

১. বনফুল— বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, আধুনিক, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৮৫, বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৮৬-১৮৭।
২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর— প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক, মেদিনীপুর—৭২১১০১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ ১১।
৮. বনফুল— বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, আধুনিক প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৫, ১১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ ১৬৫।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৬।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৪।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৬।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৬।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৬।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৮।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৯।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭০।
২১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭০।
২২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক, মেদিনীপুর-১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১০৬।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬।
২৪. বনফুল— বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, আধুনিক, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৫, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১১০।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ ২৮।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ ২৮।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ ২৮।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ২৯।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৩০।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ২৯।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ২৯।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ ২৯।
৩৩. রায়, অন্নদাশঙ্কর : তারুণ্য, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৯২।
৩৪. চক্রবর্তী, রামী : আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৫৭।
৩৫. বনফুল— বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, আধুনিক, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৫, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১০৬।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬।
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮।
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮।
৪০. চক্রবর্তী, রামী : আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৭১।

দাম্পত্য সমীকরণ : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি উপন্যাস

সোমা চক্রবর্তী

সুচিত্রা ভট্টাচার্য দীর্ঘ সময় পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন সোনার ফসল। নারী মনস্তত্ত্বের দরজা উন্মুক্ত করেছেন সফলভাবে। জীবনের উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতার পাশাপাশি নারী মনের গভীরে চাপা পড়ে থাকা আলো অন্ধকারের অন্বেষণ করেছেন তিনি। খুঁজে এনেছেন সমাজ ও নারীর প্রকৃত অবস্থানটিকে। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহে। বর্তমান আলোচনায় বেছে নিয়েছি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি উপন্যাস— 'হৃদয় অতল' এবং 'আবর্ত'। উপন্যাস দুটি থেকে খুঁজে নেব সুচিত্রার নারীর মনের সত্যান্বেষণের একটি দিক।

'হৃদয় অতল' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে সুদীপা। সুদীপা নারী। কর্মরতা। তার স্বামী চন্দন, পুত্র বাবান। বিবাহযোগ্য বয়সে বাবা-মার পাত্র অন্বেষণ সূত্রেই সুদীপার সঙ্গে চন্দনের পরিচয়। চন্দনের পরিবার পণ চাওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় সুদীপাদের তরফে। কিন্তু সুদীপাকে চন্দন রাস্তায় এসে অনুরোধ করে তাকে বিয়ে করতে, এমনকি প্রায় জোরও করে সে। তার তীব্র আর্তির কাছে আবেগে ভেসে গিয়েছিল সদ্য তরুণী সুদীপা। অতএব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তাদের বিয়ে। তারপর চব্বিশটি বছর অকারণ সন্দেহে আর প্রভুত্বে সুদীপার জীবনের সমস্ত সুখ-আনন্দ বিসর্জিত হয় চন্দনের পায়ের নীচে। পুরুষের অধিকারবোধ এবং প্রবল প্রভুত্ব বোধে সুদীপার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে চন্দন। প্রেমের লেশমাত্র অনুভূতি সুদীপা খুঁজে পায়নি। তথাপি সাহস করেনি বেরিয়ে যেতে সংসার ছেড়ে। পুত্র সন্তানকে মাঝখানে রেখে যুযুধান দুটি মানুষ চালিয়ে গেছে সংসারজীবন, মূলত সুদীপাই। সে চাকরি করতেও দ্বিধান্বিত ছিল তার 'ভয়'-এর জন্য। তবু সুদীপা লুকিয়ে জেদ করে চাকরি জোগাড় করলে চন্দনের দুর্ব্যবহারের মাত্রা যায় বেড়ে। তথাপি সুদীপা রয়ে যায় সংসারে। এবং শেষ অবধি সয়ে যায়। চন্দনের প্রতি তার প্রেম অন্তর্হিত হয়।

আসলে সুদীপা প্রথমত 'সহজ সরল' একজন মেয়ে থেকে ক্রমশ বাস্তববাদী, প্রতিবাদী কিছুটা-বা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সমাজে পিতৃতন্ত্রের শাসন আজও খুব স্বাভাবিক। এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরও এক সত্য, যাকে আমরা মর্ষকামিতা বলতে পারি। ভারতীয় মেয়েদের অনেকাংশই পিতৃতন্ত্রের এই শাসনের ভিতর মুখ ডুবিয়ে থাকে। বাতাস যতই স্বল্প হোক না কেন, সেখানে কষ্ট করে শ্বাস নিতে হলেও

চক্রবর্তী, সোমা : *দাম্পত্য সমীকরণ : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি উপন্যাস*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৬৭-৬৯

মেয়েরা বেরিয়ে আসতে চায় না সম্পর্ক থেকে। এবং তার মধ্যে গড়ে ওঠে একধরনের প্রতিরোধ, এক রকম প্রতিশোধস্পৃহা। যার জন্যই সে থেকে যায় এবং চন্দনের অকারণ সন্দেহের আগুনে পুড়ে যাওয়াকে সহ্য করে। কিন্তু মূল জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নারীর দুর্বলতা, কোমলতা, সামাজিক একটি বন্ধনের স্পৃহা, আকাঙক্ষা। চন্দন নার্সিংহোমে ভর্তি থাকাকালীন সুদীপাও ভেবেছে, সে কেন রয়ে গেল, সহ্য করে গেল এতগুলো বছর। প্রতিমুহূর্তের অপমান, গ্লানিময় একটি জীবন, প্রেমহীন একটি সম্পর্ক যেখানে অধিকারবোধ শেষপর্যন্ত কুৎসিত আক্রমণে পরিণত হয়েছে, সুদীপা সেখানে থেকে গেছে। সে চাকরি করে স্বনির্ভর হওয়ার পরও সংসারে থেকে গেছে। ছেলের উক্তিটি মনে রাখব— 'বিকজ ইউ আর স্টিল ইন লাভ উইথ দ্যাট পারসন। ... ঘাটিয়া পতিকা পেয়ারমে ফাঁসি হুয়ি টিপিকাল ভারতীয় আওরত'। তাই চন্দনের মৃত্যুর পর সুদীপার মনে হয়েছে 'ধূ ধূ প্রান্তর'-এর কথা, যেখানে ঘাসবিহীন রুক্ষতা। সুদীপার মনে পড়েছে সেই দিনটার কথা যেদিন চন্দন তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সারাজীবন একটি অসুন্দর বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে থেকেও সে খুঁজে পেতে চেয়েছে প্রথম যৌবনের আর্তিটিকে। স্বামীর সমস্ত সন্দেহের পিছনে সে বসিয়েছে ভালোবাসার যুক্তিকে বা বসাতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা না-থাকলেও আসলে একটি নিজস্ব পুরুষের অস্তিত্ব তাকে পূর্ণতা দিয়েছিল, যা তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল সুদীপার মনে হয়েছে।

সমস্ত কাহিনিতে সুদীপার এই নারীত্বের প্রতিফলন, একটি নির্ভরতা যা পুরুষের উপস্থিতিতে প্রাপ্ত। একই সঙ্গে কাজ করেছে প্রেমের অধিকারবোধ। ভালোবাসলে সন্দেহ করা বা অত্যাচার করাটা আজও পিতৃতন্ত্রের অধিকারের মধ্যে পড়ে— এই বাস্তব সত্যই উপন্যাসে প্রতিফলিত। যার পাশাপাশি ভারতীয় নারীর প্রবণতা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অন্য একটি উপন্যাস 'আবর্ত'। এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র চৈতী। আধুনিক সমাজ জীবনের ফসল চৈতীর মতো নারীরা। অহং-এর কারণে, ইগো ক্ল্যাশ বা পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ-এর কারণে ভেঙে যাচ্ছে বহু দাম্পত্য। 'আবর্ত'-এর মধ্যে রয়েছে এই রকম একটি বিষয়।

চৈতীর স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তার জগৎ ইট-বালি-সিমেন্ট-কংক্রিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনযাপনের নান্দনিক দিকগুলি সে উপেক্ষা করতে বাধ্য হলেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে তার ঘাটতি নেই। চৈতী আধুনিক নারী।

সে বই পড়া, গান শোনা, নাটক, বইমেলা পছন্দ করে। সে ফিগার কনশাস, সামাজিক। তার সাধারণ পরিশ্রমী অর্থবান কিন্তু 'অ-রোমান্টিক' স্বামী পছন্দ নয়। স্বামীর বাবা-মা, অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে সংসার করতে তার আপত্তি আছে, এবং তাকে তা করতেও হয় না। কিন্তু তার মনে হয় তার স্বামী একটি শরীরসর্বস্ব জীব মাত্র। প্রথম সন্তানের জন্মের পর বহু পরিশ্রমে চৈতী তার শারীরিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার পর, পুনরায় সন্তানসম্ভবা হলে তার মনে হয় তার স্বামী ইচ্ছাকৃত তাকে বন্ধনে বাঁধতে চাইছে। সন্তানের অছিলায় কেড়ে নিতে চাইছে তার স্বাধীন আকাশ। তাই গর্ভপাত করাতে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি করে আর স্বামীর কাছে ফিরে যায় না। স্বামীর থেকে সন্তানের 'মেনটেনেন্স চার্জ' বাবদ অর্থ কিন্তু নিয়ে থাকে। যা সুমন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দেয়। কেন সে স্বামীকে ছেড়ে আছে, তা সে কাউকেই জানায়নি, এমনকি স্বামীকেও নয়। চৈতী চাকরি নিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে পিতৃগৃহে থাকায় সে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। কালচারাল গ্যাপ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে দাম্পত্যের থেকে।

যদিও মেয়েদের আড্ডায় স্বামীদের উপস্থিতি তারা পছন্দ করে না, কিন্তু স্বামীর সংসারে থাকার সুখ পরিপূর্ণভাবেই তাদের সুখী করে। আর রঞ্জনার পরিবারে বিধবা মা ও তার অবস্থান, বিবাহবিচ্ছিন্না হওয়ার ফলে যে সমস্যার মুখোমুখি সে দাঁড়ায় তা চৈতীকে নাড়া দেয়। এবং তৎকালীন বিবাহযোগ্য ভাইয়ের বিরক্তি

প্রকাশের ঘটনাগুলি তাকে ভাবিত করে। দাম্পত্যের দোলাচলতা, পরবর্তী সময়ের নিরাপত্তাহীনতার ভয় তাকে প্ররোচিত করে সুমনের সঙ্গে দেখা করতে, দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে। আসলে চৈতী নিজেই কনফিউজড। তার কী করা উচিত, কী করা অনুচিত সেটা নিয়ে গভীরভাবে সে কখনও ভাবেনি। তার মুক্তি ও স্বাধীনতা নিয়ে সে নিমগ্ন থেকেছে। কিন্তু, যে স্বাধীনতা সে উপভোগ করতে চাইছে, তার স্বরূপ সম্পর্কে সে কখনও ভাবেনি। এই দিক থেকে অনেকটাই পরিণত সুদীপা। চৈতী যখনই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে, সে স্থান পাত্র ত্যাগ করতে চেয়েছে। যখন সুমনের দিক থেকে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করেনি, তখন সুমনকে ছেড়ে এসেছে বাবার বাড়ি। বাবার বাড়িতে যখন ভাইয়ের অসহিষ্ণুতার আঁচ পেয়েছে, তখনই সে ভাবতে শুরু করেছে নতুন আশ্রয়ের। মৌখিকভাবে না হলেও তার নারীসুলভ আশ্রয়লুব্ধ মনটিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের এই উপন্যাস দুটিতে মূলত দাম্পত্যের জটিল আবর্তে দাঁড়ানো দুজন নারী, যারা শেষ পর্যন্ত আশ্রয় সন্ধানী হয় মানুষের কাছে, যার অন্য নাম প্রেম। রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনীকে মনে পড়ে আমাদের। সেখানেও কুমুর বাপের বাড়ি চলে যাওয়া, বা মধুসূদনের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরির পশ্চাতে এই সাংস্কৃতিক অসাম্য একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও মধুসূদনের পজেসিভনেস ছিল না সুমন তথা চৈতীর স্বামীর চরিত্রে। কুমুর ক্ষেত্রে কাজ করেছিল যে যৌনভীতি, তা কিছুটা হলেও চৈতীর মধ্যে দেখতে পাই। তবে চৈতীর আপত্তির জায়গা সন্তানধারণে, যৌনতায় নয়। তার স্বাধীনতা ও পছন্দের সঙ্গে সুমনের মানসিক গঠনের অমিল। পরবর্তী কালে যা অহংযুদ্ধে পরিণত হয়। কেবলমাত্র রুচির অমিলের জন্য চৈতী তার স্বামীর কাছ থেকে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— আধুনিক নারীমানসের এটি একটি ক্রমশ বেড়ে চলা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা একা থাকতে পছন্দ করছে, তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় একজন পুরুষের তর্জনীকে সে মেনে নিতে পারছে না। তার জীবন একান্তই তার নিজস্ব হয়ে থাকবে। যদিও মেয়েদের এই একা বাঁচতে চাওয়ার প্রবণতা আমরা আগেও পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের মৃণাল (স্ত্রীর পত্র), অনিলা (পয়লা নম্বর)-র মধ্যে, আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী (প্রথম প্রতিশ্রুতি) বা বকুল (বকুলকথা)-কে দেখেছি। বকুল অবশ্য বিবাহিত নয়। বিবাহিত মেয়েদেরও একা থাকার প্রবণতা, এবং বলা ভালো ব্যক্তিগত একটি নিজস্ব জীবন কাটানোর ইচ্ছা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায় আমরা পাই।

আলোচ্য দুটি উপন্যাসেই দুজন নারীর অসুখী দাম্পত্যের ছবি। একজন শেষ পর্যন্ত পেয়েছে প্রথাকে মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্বাধীনতাকে এবং শৃঙ্খলকে সমানভাবে বহন করতে, অন্যজন বিবাহিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত নারী হৃদয়ের গোপন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় দুই নারী। সুদীপার সন্দেহপ্রবণ রুক্ষ স্বামীর মৃত্যুতে তার জীবনে শূন্যতা নেমে এসেছে। আর চৈতী ফিরতে চেয়েছে তার নিরপরাধী-কাজপাগল-দায়িত্বশীল-অ-রোমান্টিক-ভালো মানুষ স্বামীর কাছে। যদিও শেষ মুহূর্তে বড় হয়ে যায় চৈতীর ইগো। কিন্তু তারা আসলে বিবাহ নামক ইনস্টিটিউশনকেই মেনে নিতে চেয়েছে, সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, বেরোতে চায়নি।

উপন্যাসদুটির শেষে পৌঁছে আমরা কিন্তু সমাজের নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক সহাবস্থানের তীরেই পৌঁছে যাই, যার— 'অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'।

বনফুলের সাহিত্য ভুবনে কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

বরুণ কুমার সাহা

১.০ ভূমিকা

বনফুল ছদ্মনামে পরিচিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা প্রথম নজরে শ্রেষ্ঠ গল্পকার অথবা বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও তাঁর কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, দিনলিপি, স্মৃতিগ্রন্থ ইত্যাদি রচনা আমাদের মুগ্ধ করে এবং বনফুলের বিচিত্র সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। ছেলেবেলা থেকেই বনফুলের মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যখন তিনি *থার্ডক্লাসে* পড়ছিলেন তখনই তাঁর মনে সাহিত্য প্রেরণা উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। সে সময়ই তিনি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'বিকাশ' বের করেন। বলা যেতে পারে যে এই বিকাশ-এর মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। তিনি বলেছেন—

> ... 'বিকাশ' পত্রিকার জন্য প্রতিদিন বৈকালে এবং রাত্রে খাওয়ার পর রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমাকে খাটিতে হইত... বেশীর ভাগ আমিই লিখতাম। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য সব আমাকেই লিখতে হইত[১]।

১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। হেড মাস্টার রামচন্দ্র ঝার নির্দেশে এরপর তাঁকে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদও করতে হয়েছিল।

বনফুলের ছদ্মনাম চয়ন পর্বটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতির প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন বলাইচাঁদ। জীবজন্তু পোষারও খুব ঝোঁক ছিল তাঁর। বন-জঙ্গল, পশুপাখি ইত্যাদি নিয়েই ছোটবেলায় এক বড় অংশ পার করেছিলেন তিনি, আর তাই ভৃত্য মহলে তাঁর নাম ছিল জংলিবাবু। প্রকৃতির প্রতি এই দুর্বলতা ছিল বলেই ছদ্মনাম চয়নের ক্ষেত্রে তিনি 'বনফুল' নামটি পছন্দ করলেন। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই বলেছেন—

> বাল্যকালে অনেক কীট-পতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার

সাহা, বরুণ কুমার : *বনফুলের সাহিত্য ভুবনে কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*
অরুণ, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ ২০১৬ সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৭০-৭৫

জন্য অনেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য নিকেতন।

এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম[২]।

বালক বলাই-এর সেসময় জানাই ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনফুল'। তবে ছদ্মনামের আড়ালে বনফুলের সাহিত্য চর্চার পেছনে আরেকটি ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। কবিতা লেখার নেশা সে সময় মেধাবী ছাত্র বনফুলকে পেয়ে বসেছিল, আর এই নেশায় তাঁর পড়াশোনা তলিয়ে যাবে ভেবে হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা তাঁকে শাসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসন বনফুলের সুগন্ধকে আটকে রাখতে পারেনি, কারণ ইতিমধ্যে 'বনের কুসুম গন্ধে পড়েছে ধরা'[৩]। বনফুল হেড মাস্টারের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছন্মনামকে হাতিয়ার করে এক অভিনব পন্থা বের করলেন। পরবর্তীকালে এই ছদ্মনামই লেখকের আসল পরিচয় হয়ে উঠল।

১.১ কবি বনফুল

বনফুল সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন কবিতার হাত ধরে। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়েই তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়। সৃজনী শক্তির অধিকারী ছোটভাই ভোলানাথ কবিতা লিখে বাড়ির সবাইকে বিস্মিত করলে বনফুলও মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হন এবং লিখে ফেলেন 'ময়ূর' নামে একটি কবিতা। এখান থেকেই শুরু হল কবিতার হাত ধরে বনফুলের সাহিত্য জীবনের যাত্রা, যা থেমেছে আশি বছর বয়সে সরস্বতীর বন্দনা দিয়ে। এরপর হাতে লেখা 'বিকাশ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা চর্চার অনুশীলন চলতে থাকে। স্বনামে ছাপার অক্ষরে প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয় 'মালঞ্চ' পত্রিকায় যা তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। ড. ঊর্মি নন্দীর ভাষায় 'কবিত্ব-গৌরবের প্রথম ভিতটি' রচিত হল এর মধ্য দিয়ে।[৪] এরপর পণ্ডিত রামচন্দ্র ঝার আগ্রহে তিনি বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং ১৯১৮ সালে তৎকালীন অভিজাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে একটি চারলাইনের অনূদিত কবিতা প্রকাশিত হয় 'নাছোড়বান্দা' নামে—

ঘরের গৃহিণী ও দেশের জমিদার
কোলের ছোটছেলে, ভিখারী দরোজার
আছে কি নেই তার করো না পরোয়ার
কেবলি মুখে বলে দাও গো দাও।[৫]

'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে এরপর থেকে বনফুলের সাহিত্য প্রতিভার সুরভি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ড. নিশীথবাবুর মতে—

বস্তুত এখানে থেকেই শুরু হয়ে যায় সাহিত্যের পথে তাঁর গৌরবময় যাত্রা[৬]।

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর গদ্য-পদ্য রচনাবলির মধ্যে কবিতাগুলিই সতেজ ও ক্ষুরধার। কলেজ জীবনেও কবি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি প্যারডি রচনাতেও নিজের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আত্মজীবনীতে বনফুল উল্লেখ করেছেন যে সে যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের একটি জনপ্রিয় গান ছিল—

আমি এসেছি, এসেছি এসেছি বঁধূ হে
নিয়ে এই হাসি-রূপ গান[৭]

বনফুল ইতিহাস বিষয়টিকে নিয়ে এর প্যারডি রচনা করে কলেজ জীবনে বিতর্কের ঘেরাটোপে পড়েছিলেন—

আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে
ঠোঁটে করে সারা ইতিহাস
আমার যেটুকু আছে, এনেছি তোমার কাছে

দয়া করে করে দিও পাশ।[৮]

আত্মজীবনীতে বনফুল জানিয়েছেন যে, শিক্ষাজীবনে একবার তিনি অধ্যাপক ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে থিয়েটারের জন্য 'ওয়েলকাম সং' লিখেছিলেন—

মরণ লইয়া ঘর করি মোরা বেদনা মোদের সাথি
আর্ত আহত আতুর লইয়া কাটাই দিবস রাতি।[৯]

জীবনে মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বনফুল অসংখ্য কবিতা লিখেছেন যা সংকলিত হয়েছে ছয়টি গ্রন্থে 'বনফুলের কবিতা' (১৯৩৬), 'অঙ্গারপর্ণী' (১৯৪০), 'করকমলেষু' (১৯৪৯), 'ব্যঙ্গ কবিতা' (১৯৮৫), 'নূতন বাঁকে' (১৯৫৯), 'সুরপঞ্চক' (১৯৭০)। এছাড়া তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'চতুর্দশী' (১৯৪০) ও 'আহরণীয়' (১৯৪৩)।

১.২ নাট্যকার বনফুল

নাট্যকার হিসেবেও বনফুল বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮), 'রূপান্তর' (১৯৩৮), 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯), 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১), 'দশভাণ ও আরও কয়েকটি' (১৯৪৩), 'মধ্যবিত্ত' (১৯৪৩), 'বন্ধনমোচন' (১৯৪৮)। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন 'সিনেমার গল্প' (১৯৪৬), 'দ্বৈরথের চিত্রনাট্য রূপ' (১৯৪৬), 'কঞ্চি' (১৯৪৫), 'শৃন্বন্তু' (১৯৬৩), 'আসন্ন' (১৯৭৩) ইত্যাদি। বাংলা নাট্য সাহিত্যে তিনি যে অভূতপূর্ব কাজটি করে গেছেন, সেটা হচ্ছে উনিশ শতকের দুজন বাঙালি মনীষীর জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি দুখানা পূর্ণাঙ্গ জীবনীনাটক রচনা করেছেন— 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর'। তিনি ইচ্ছে করলে এজাতীয় আরও কয়েকটি নাটক লিখতে পারতেন, কিন্তু করেননি। এর কারণ তিনি নিজেই নির্দেশ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে—

> আমার শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকগুলি নাটক লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে সব নাটকে নকল-নবিশী প্রতিভা ছাড়া অন্য প্রতিভা দেখা যায় নাই। অনেকে নির্লজ্জের মতো আমার সৃষ্ট চরিত্র এবং আমার লেখা সংলাপগুলিও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আরও অনেকের জীবনী লইয়া আমার নাটক লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চোরদের ভয়ে আর লিখি নাই।[১০]

বনফুলের এই নাট্যপ্রতিভা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে বনফুল যেন তাঁকে কেন্দ্র করেও একটি নাটক লেখেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'শনিবারের চিঠি'-র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় 'অন্তরীক্ষে' নাম দিয়ে একটি একাঙ্ক নাটক বনফুল লেখেন—

> এই নাটকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলাম।[১১]

বনফুল বেশ কিছু একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন, যেমন— সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত 'শিককাবাব' ভীতি-শিহরণ জাগানো নাটক 'অবাস্তব', রূপক নাটক 'জল'। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন মনস্তত্ত্ব-প্রধান নাটক 'বানপ্রস্থ', হাস্যরসাত্মক 'কবয়ঃ' ইত্যাদি।

১.৩ প্রাবন্ধিক বনফুল

বনফুল বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন, তবে সেগুলির বেশিরভাগই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠের জন্য রচিত। লিখিত ভাষণ বা বক্তৃতার সীমার মধ্যে থেকেও বনফুল স্বচ্ছন্দে প্রবন্ধ সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন। এ ধরণের কিছু প্রবন্ধ সংকলন হিসেবে 'মনন' গ্রন্থাকারে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ১৬টি প্রবন্ধ সংগৃহীত, সেগুলি হচ্ছে— 'বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা', 'সংস্কৃতি কোন পথে', 'নাট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ', 'ভাল বাংলা নাটক কেন নেই', 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন', 'রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান, 'বাংলা সাহিত্যের

বর্তমান গতি', 'বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ', 'বাংলা সাহিত্য', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'প্রেমচন্দ্রের স্মরণে', 'আমরা বাঙালী,', 'বাংলার বাহিরে বাঙালীর শিক্ষা সমস্যা', 'ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত', 'ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার', 'সম্বর্ধনার উত্তরে' ইত্যাদি। বনফুলের 'দ্বিজেন্দ্র দর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খিস্টাব্দে। এতে চারটি প্রবন্ধ পাই— 'ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল', 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল', 'স্বদেশ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল' ও 'ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল'। এই প্রবন্ধগুলি মূলত ভাষণ-বক্তৃতা। ভাগলপুরে বুদ্ধপূর্ণিমা সম্মেলনে 'বুদ্ধদেবের জীবনে নারী' প্রবন্ধটি বনফুল পাঠ করেছিলেন, যা সাহিত্যের দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট। সুজিত ঘোষ মনে করেন—

> মনে হয় এই প্রবন্ধটিই বনফুলের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের মর্যাদা পেতে পারে। একই সঙ্গে মহাপুরুষের জীবনের মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধার পাশাপাশি তাঁদের মানবিক মূর্তি অত্যন্ত সহজ সরল প্রত্যক্ষতায় বনফুল চিত্রিত করেছেন।[১২]

বীতশোক ভট্টাচার্য বনফুলের প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে 'বনফুলের প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যেখানে তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিষয় ভিত্তিক ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যেমন— শিল্প ও সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি।[১৩] এ ছাড়াও বনফুলের যেসব প্রবন্ধ গ্রন্থ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল— 'উত্তর' (১৯৫৩), 'শিক্ষার ভিত্তি' (১৯৫৫), 'ভাষণ' (১৯৭৮) ইত্যাদি।

১.৪ স্মৃতিগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের সম্পর্ক ছিল সুমধুর। বনফুল বেশ কয়েকবার কবিগুরুর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেইসব স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্র স্মৃতি' গ্রন্থটি লেখেন। ভূদেব চৌধুরীর একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে বনফুল এই গ্রন্থটি লিখতে বসেন, তাই গ্রন্থটি লেখক ভূদেববাবুকেই উৎসর্গ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বনফুলের ভক্তি ছিল অপরিসীম। তাঁর ভাষ্য—

> ভক্তির মাত্রা এত বেশি ছিল যে তাঁকে দেবতা বলে' মনে করতাম। তাঁর দেবত্বে কোন রকম কলঙ্ক সহ্য করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে।[১৪]

রবীন্দ্র-বনফুল সম্পর্ক ও তাঁদের বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা থেকে শুরু করে নানা বিষয়ক কথা। এর সঙ্গে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অনেক চিন্তা ও বক্তব্য গ্রন্থটিকে একটি আলাদা মর্যাদা প্রদান করেছে।

১.৫ দিনলিপি

বনফুল ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন 'মর্জিমহল' শিরোনামে ডায়েরি লিখতেন। প্রথম বছরের ডায়েরিটি রামায়ণী প্রকাশ ভবন ১৯৭৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এরপর বনফুলের পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবনায় বাণীশিল্প ২০১১ সালে বনফুলের 'মর্জিমহল' সম্পূর্ণরূপে দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। বনফুলের ডায়েরির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব যে এটা শুধু তথাকথিত দিনলিপি নয়, এখানে রয়েছে লেখকের সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি থেকে শুরু করে দেশ তথা বিশ্ব-ভাবনা। নিজের শখ আহ্লাদ, যেমন পাখি দেখা, মাছ ধরা, বাগান করা, কবিতা লেখা ইত্যাদি সমস্ত কিছু দিনলিপির ছত্রে ছত্রে ধরা পরে। শেষ বয়সের দিনলিপিগুলিতে বনফুল স্ত্রী লীলাবতীর স্মরণে তাঁকে উদ্দেশ করে লিখতেন। বীতশোক ভট্টাচার্য 'মর্জিমহল' সম্পর্কে লিখেছেন—

> বনফুলের ডাইরি মূলত হস্তলেখ, দিনাঙ্ক অনুসারে সেই লিখনক্রমের বিন্যাস, বছর দশেক আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনুযায়ী তাঁর প্রতিবেদন ক্রমপুঞ্জিত। মানবিক সমাজ সভ্যতার পটভূমিতে কোনোও প্রতিষ্ঠানিক ভূমিকা গ্রহণের স্ব আরোপিত দায় স্বীকার না করেও তাঁর দৃষ্টি প্রত্যহের সংবাদপত্রে

> লগ্ন; ভারতের সরকারি নথির চাপ সেখানে নেই, নেই ব্যবসায় ওজনদার জাবদাখানা, তাঁর রোজনামচা তাঁর হাতে ভুবনের ভার তুলে দিয়েছে মনে হলেও তাঁর ঝর্নাকলমের বর্ণে বর্ণে যেন নিবন্ধন লঘুতা, সদ্য-দেখা নতুন একটা পাখির উড়ানের মতোই তা চকিত এবং চঞ্চল।[১৫]

১.৬ **আত্মজীবনী**

বনফুল জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'পশ্চাৎপট' নাম দিয়ে আত্মজীবনী লেখেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে গ্রন্থালয় এবং লেখক এটা উৎসর্গ করেন নিজের চার সন্তান কেয়া, অসীম, চিরন্তন ও করবীকে। এই গ্রন্থটি রচনাকালে বনফুল যেন শৈশব থেকে শুরু করে বিগত জীবনের দিনগুলিকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছেন। এই গ্রন্থটিতে লেখক নিজের সম্পর্কে যেমন অনেক নতুন ও অজানা তথ্যের সঙ্গে আমাদের অবগত করিয়েছেন, তেমনি অনেক পরিচিত-অপরিচিত চরিত্র কথার মধ্যে উঠে এসেছে এখানে। তাঁর বনফুল ছদ্মনাম গ্রহণের রহস্য, সাহিত্য রচনার উৎস ও আগ্রহ, মেডিক্যাল কলেজের নানা অভিজ্ঞতা, সাহিত্যে ব্যক্তি জীবনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও গ্রন্থটিকে মনিহারী, হাজারিবাগ, আলিমগঞ্জ, ভাগলপুর ইত্যাদি অংশে ভাগ করে লেখক জীবনের ধারাবাহিকতাকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

১.৭ **চলচ্চিত্রায়ন**

বনফুলের অনেক গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পাশাপাশি দর্শকও সেগুলি সাদরে গ্রহণ করে। ১৯৪৯ খ্রি. বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হয়। এর পরিচালনায় ছিলেন বিমল রায়। পরে ১৯৭৭ খ্রি. লেখকের ভাই প্রখ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মখোপাধ্যায় ছবিটির পুনর্নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও অরবিন্দ ১৯৫৯ খ্রি. 'কিছুক্ষণ', ১৯৭৫ খ্রি. 'অগ্নীশ্বর' প্রভৃতি উপন্যাস অবলম্বনে ছবি নির্মাণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫০ খ্রি. 'ভীমপলশ্রী' উপন্যাসটিকে 'একটি রাত' নাম দিয়ে ছবি নির্মাণ করেন চিত্ত বসু। পরিচালক তপন সিংহ ১৯৬৭ খ্রি. বনফুলের 'হাটে বাজারে' উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দিয়ে Combodia Asian Film Festival-এ Best Film-Royal Cup আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণকমল পুরস্কার লাভ করেন।

অবশ্য এর আগেও তিনি 'আরোহী' নাম দিয়ে বনফুলের বিখ্যাত গল্প 'অর্জুন মণ্ডল'-এর চলচ্চিত্র রূপ প্রদান করেছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় 'অর্জুন পণ্ডিত' নামে হিন্দি ভাষায় ছবিটি নির্মাণ করেন। সঞ্জীব কুমার এই ছবিটিতে অভিনয় করে ১৯৭৭ খ্রি. Filmfare Awards-এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বেস্ট স্টোরি' খেতাব লাভ করেন। এ ছাড়াও মৃণাল সেন ১৯৬৯ খ্রি. 'ভুবন সোম' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত করে National Film Awards-এর Best Director হন।

১.৭ **উপসংহার**

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের যুগে বনফুল এক আলাদা আসন দখল করে রয়েছেন মূলত তাঁর কতগুলি বিশেষ গুণের জন্য, আর সেগুলি হচ্ছে তাঁর সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্রের প্রাচুর্য, অভিনব শৈলী ও উপস্থাপন কলা, পেশাগত অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রতিফলন, বিজ্ঞানী মেজাজ ও কবিত্ব প্রতিভার প্রকাশ ইত্যাদি। তিনি একদিকে যেমন পাঠককে অণুগল্পের মতো ক্ষুদ্রাকৃতির সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তেমনি ডানা-জঙ্গমের মতো বিশালাকৃতির উপন্যাসের রসাস্বাদনও করিয়েছেন। আবার কথা সাহিত্যের বাইরে গিয়েও তিনি রচনা করেছেন কবিতা, নাটক, স্মৃতিগ্রন্থ, দিনলিপি ইত্যাদি আরও অনেক। এমনকি চলচ্চিত্রায়নের মধ্য দিয়েও তাঁর সাহিত্যরস ধরা পরেছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বনফুলকে তাই

সব্যসাচী লেখক বলে সম্বোধন করেছেন—

> উপন্যাস গল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ নকশা ছাড়া প্রবন্ধ রম্যরচনায় তাঁর অনায়াসনৈপুণ্য। প্রমথনাথ বিশী ছাড়া সমসাময়িক লেখকদের আর কারুর সঙ্গে তাঁর সব্যসাচিত্বের তুলনা চলে না।[১৬]

সমসাময়িক লেখকদের কাছেও তাই বনফুল ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। লেখকের জন্মদিনে তাই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক-বন্ধু শুভেচ্ছাবাণীর পাশাপাশি ব্যক্ত করেছেন বনফুলের প্রতিভাকে এভাবে—

> সৃষ্টির প্রারম্ভে সকল ফুলইতো ছিল বনফুল। গুণসগৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দেবসেবার জন্য তাকে স্থান দিয়াছে। বঙ্গভারতী পূজা মন্দিরে অজানা, অচেনা, স্বর্গীয় সুষমা ও সৌরভমণ্ডিত ফুলের সন্ধান পাইয়া বাঙালি আজ অকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে তাকে পূজা মন্দিরে স্থান দিতে চায়, নাম দিতে চায়। ... অর্জুন যেমন কুবেরের ভাণ্ডার জয় করিয়া স্বর্ণচম্পকে জননীর উপাস্য দেবতার মন্দির পূর্ণ করিয়াছিলেন, তুমি তেমনিই বনফুল দিয়া বঙ্গভারতীর মন্দির পূর্ণ করিয়া তুলিতেছ।[১৭]

এখানেই রয়েছে বনফুলের সার্থকতা ও সাহিত্য জীবনের পরম প্রাপ্তি। তাই আজ ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হয়তো কালের গভীরে হারিয়ে গেছেন, কিন্তু আজও বাংলা সাহিত্যের ফুল বাগানে ফুটে রয়েছেন বনফুল।

তথ্যসূত্র

১. বনফুল, পশ্চাৎপট, ১ম সংস্করণ, ১৪ জুলাই, ১৯৯, বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃ. ৩৮
২. তদেব, পৃ. ৪১
৩. পবিত্র সরকার (সম্পাদক), বনফুল শতবর্ষের আলোকে, ১ম প্রকাশ ২৯ জুলাই ১৯৯৯, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, কলকাতা, পৃ. ৭১
৪. ড. ঊর্মি নন্দী, বনফুল : জীবন, মন ও সাহিত্য, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩২
৫. ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, ১ম প্রকাশ ১৯ জুলাই, ১৯৯৮ বর্ণালী, কলকাতা, পৃ. ১৭৩
৬. তদেব
৭. বনফুল, পশ্চাৎপট, ১ম সংস্করণ ১৪ জুলাই ১৯৯৯, বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃ. ৭৬
৮. তদেব
৯. তদেব পৃ. ১২
১০. তদেব, পৃ. ২০৬
১১. তদেব, পৃ. ২০৮
১২. তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ১২০
১৩. বনফুল, প্রবন্ধ সংগ্রহ (বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদক), ১ম প্রকাশ ২০১০, অক্ষর, বিন্যাস, কলকাতা,
১৪. বনফুল, রবীন্দ্র স্মৃতি, ১ম বাণীশিল্প সংস্করণ ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ৭
১৫. বীতশোক ভট্টাচার্য, বনফুলের ডাইরি মর্জিমহল (অনুকথন), ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১১ বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃ. ৬০৯
১৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০৫
১৭. অসীম মুখোপাধ্যায়, পিতৃস্মৃতি, পিতৃকথা কিংবদন্তি বনফুল, ১ম প্রকাশ ২০১১, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ. ৪৭

দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প: নির্বাচিত পাঠ

মৌমিতা পাল

সার-সংক্ষেপ

[সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই দেশভাগের প্রতিচ্ছবি জীবন্ত রূপ নিয়েছে। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ শক্তি বাংলার ইতিহাসে প্রথম বিভাজনের রেখা টেনে দেয়। এরপর ১৯০৫— লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ। ১৯৪৭-এ ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয় ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যে চারটি দেশের বিভাজন ঘটিয়েছে, তাদের মধ্যে ভারতের বিভাজনই সর্ববৃহৎ। এই বিভাজনের প্রত্যক্ষ শিকার পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ।

দেশভাগের বাংলা সাহিত্যে আছে মূলত 'ডিস্‌প্লেসমেন্ট'-এর কথা। এই কথা নানা স্বরে, নানা ভঙ্গিতে অনেকেই তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রও (১৯১৬-১৯৭৫) ব্যতিক্রম নন। তাঁর কলমে উঠে এসেছে দেশভাগের যন্ত্রণা। 'কল্লোল'-পরবর্তী লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বয়ং ওপার বাংলা থেকে আশ্রয়ের খোঁজে শহর কলকাতায় এসেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোটগল্পে দেশভাগজনিত পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম-জীবনের স্মৃতি, সমাজের নানা রূপ অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

লেখকের বিপুল গল্পসম্ভারের মধ্যে 'পালঙ্ক', 'অবতরণিকা', 'চাকরি', 'অভিনেত্রী', 'হেডমাস্টার', 'কাঠগোলাপ', 'দ্বীপান্বিতা', 'অসবর্ণা'— বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশভাগের পরিণাম কীরূপে ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় এনেছে— ছিন্নমূল মানুষের সেইসব জীবনকথা সার্থকরূপে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

জন্মশতবর্ষে তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পগুলির সামান্য কয়েকটি নিয়েই আমাদের এ রচনার প্রয়াস।]

ভূমিকা

কথাসাহিত্য যেহেতু বাস্তব জীবনভিত্তিক সৃষ্টিকর্ম, তাই ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের ঢেউ স্বাভাবিকভাবেই তাকে উদ্‌বেল করে। এই উদ্‌বেলতা ধরা দেয় কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো-বা পরোক্ষে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের

পাল, মৌমিতা : *দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প: নির্বাচিত পাঠ*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৭৬-৮৩

ফলে অনাহারে নিঃস্বপ্রায় অবস্থায় জন্মভূমি থেকে মানুষের শিকড় ছেঁড়ার নির্মম কাহিনি সাহিত্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতের মর্মান্তিক পরিণতি হিন্দু ও মুসলমান— উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে। প্রায় দুকোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়েছেন। অশ্রুকুমার সিকদারের ভাষায়—

> পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ আসায় যে সংকট তৈরি হয়, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গে তার চেয়ে অনেক কম মানুষ চলে যাওয়ায় তেমন সংকট তৈরি হয়নি। ...পশ্চিমবঙ্গে আগত ছিন্নমূল হিন্দুদের মতো তাদের দীর্ঘ দিন কোন ক্যাম্পে থাকতে হয়নি, পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম করে জবরদখল কলোনি গড়ে নতুন করে ভিটেমাটির সংস্থান করতে হয়নি।[১]

বিন্দুসম নানা মুহূর্তকে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করে ছোটগল্প। আত্মজিজ্ঞাসা ও বিশ্বজিজ্ঞাসা— এই দ্বিমুখী অনুসন্ধানের শিল্পরূপই হল ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬) প্রমুখের আবির্ভাব বাংলা গল্পে বিশেষ শিল্পমাত্রা যোগ করেছে।

বাংলা গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। সাধারণ বিষয় থেকে শুরু করে তাঁর লেখায় স্থান ও সময়ের পরিবর্তিত অবস্থার প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন সমস্ত রকমের পরিবর্তনের অভিঘাতগুলি। তাঁর অনেক গল্পেই দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে কেন্দ্রে রেখে নরেন্দ্রনাথ আবর্তিত হয়েছেন নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির বৃত্তে। আজন্মলালিত সংস্কার ও মূল্যবোধ যখন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে— শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির সেই অসহায় সময়কে গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে মূলত প্রাধান্য পেয়েছে নিম্নবিত্ত, অতি সাধারণ জীবন যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত পরিবারগুলি— স্বাধীনতা ও দেশভাগের বিপর্যয়কে যাদের জীবন প্রবল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বস্তুত তাদের নিয়েইনরেন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন এক বদলে যাওয়া পৃথিবী। স্বরচিত গল্প-সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির আর দিন ভরে রাত ভরে লেখা গল্পগুলির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাস্তব আর কল্পিত, অরচিত আর স্বরচিত সব মিলিয়ে এই গল্পগুলি যেন আমারই জীবনবৃত্তান্ত।[২]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র: অতি অল্প-কথা

১৯১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম। বিএ পাশ করেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। সাহিত্যচর্চার শুরু ছাত্রজীবন থেকেই। প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘মূক’ ও গল্প ‘মৃত্যু ও জীবন’। গল্পের পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ‘দ্বীপপুঞ্জ’, ‘দূরভাষিণী’, ‘সাপিনী’, ‘চেনামহল’, ‘সূর্যসাক্ষী’ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ ছাড়া ‘রস’, ‘পালঙ্ক’, ‘হেডমাস্টার’, ‘অভিনেত্রী’ প্রভৃতি গল্প তাঁর শিল্পকুশলতার শিখর স্পর্শ করেছে। চার দশক ধরে প্রায় চারশো গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। ১৯৭৫ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র উদ্‌বাস্তু মানুষের বয়ান সার্থকরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি যে ছবি এঁকেছেন, সেখানে তাঁর চরিত্র বলে ওঠে, ‘গরিবের হিন্দুস্থানও নাই পাকিস্তানও নাই’।

পালঙ্ক: 'গরিবের হিন্দুস্থানও নাই পাকিস্তানও নাই'

জীবনরক্ষার বাসনায় যখন হিন্দু-মুসলমান বাংলার এপার-ওপার হচ্ছিল, তখন মূক দেবদারু গাছটির মতোই মাটির শিকড় আঁকড়ে পড়ে রইলেন বৃদ্ধ রাজমোহন।

দেশভাগের বিপর্যয়ে অনেক অবস্থাপন্ন পরিবারকেই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবু জীবন থেমে থাকেনি। ভাঙামনের স্মৃতি আঁকড়ে আবার নতুন করে জীবন গড়ার ভাবনায় মত্ত হয়েছিলেন তাঁরা। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই হঠাৎ দরিদ্র মানুষদের জীবন হয়ে উঠেছিল নিতান্তই দুঃসহ ও কঠিন। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে ওঠে রাজমোহনের পুত্র সুরেন। দিনরাত দেওয়াল আর মেঝে থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে— ফলে বাচ্চাদের অসুখ সারে না। নিরুপায় পুত্রবধূ অসীমা আর্থিক সাহায্যের জন্য নিজের বিয়ের পালঙ্কখানা বিক্রি করতে অনুরোধ জানায়। যাতে সে টাকায় খাট, তক্তপোশ— যা হোক কিছু কিনে বাচ্চাদের অসুখ থেকে বাঁচানো যায়। পুত্রবধূর কথায় পালঙ্কখানা বেচে রাজমোহনের যারপরনাই অনুশোচনা জন্মে। এই বৃদ্ধ দাম্ভিক পুরুষটি জীবনে শুধু কিনেইছেন, কখনও কোনো কিছু বিক্রি করেননি।

আমৃত্যু তাঁর শখের বাড়ি-সম্পত্তি-আসবাবপত্র তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেরেছেন কি?

পালঙ্ক এখানে একটি প্রতীক। এই শৌখিন জিনিসটি আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি। চারদিকে চারটি পায়ার বড় বড় বাঘের থাবা আর ভারি সুন্দর নকশার কাজও রয়েছে। এই শৌখিন জিনিসখানা মকবুলের মতো সামান্য মানুষের কাছে অলীক স্বপ্নের মতোই। দেশভাগের সুযোগে এই স্বপ্নকে সে সত্যি করেছে। আর্থিক দুরবস্থাগ্রস্ত মকবুলের স্ত্রী ফতেমার কাছে এ পালঙ্ক মরা কাঠ আর স্বামীর জেদ ছাড়া কিছু নয়। অন্যদিকে মকবুলের কাছে ওই কাঠে জমা রয়েছে বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণি সম্পর্কের ঐতিহাসিক নিষ্পেষণ ও হীনম্মন্যতার বিরুদ্ধে গোপন ও পরোক্ষ এক সত্তার প্রতিবাদ।

জমি ও জমিদারের দাপটে যুগ-যুগ ধরে গরিব মুসলমান শোষিত হয়েছে বর্ণ হিন্দুর কাছে। এই শ্রেণি-সংঘাত ঐতিহাসিকভাবেই বর্ণ ও ধর্ম বিশেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বাংলায়। দেশভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম মানুষের জীবনে একপ্রকার আশীর্বাদই। কিন্তু এ-ও সত্যি যে অর্থনৈতিকভাবে যুগ-যুগ ধরে বঞ্চনার শিকার মানুষদের সেভাবে আর্থিক পরিবর্তন হয়নি।

অনাহারে ক্লিষ্ট ফতেমা যখন মকবুলকে বলে যে পাকিস্তানে মুসলমানদের রাজত্ব, তাও কেন মুসলমানেরা না-খেয়ে মরবে। ফতেমার এ কথার উত্তরে মকবুল বলে—

> গরিবের হিন্দুস্থানও নাই পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি গোরস্থান।[৩]

শেষে গল্প আরও এককাঠি এগিয়ে সমস্ত তিক্ততাকে ভুলিয়ে দেয়, যখন রাজমোহন তার সেই পালঙ্কে মকবুলের পুত্র-কন্যার ঘুমিয়ে থাকার মধ্যে দেখলেন তাঁর রাধাগোবিন্দকে। কষ্ট কল্পনা সত্যের শেষ সীমাকেও বোধহয় লঙ্ঘন করা গেছে এখানে।

জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব

দেশভাগ ভেঙে দিয়েছে প্রজন্মলালিত সংস্কার।[৪] এই পর্বেই বাঙালি মেয়েদের উপর উপার্জনের চাপ আসতে শুরু করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বগত ভাব অপেক্ষা বাস্তবের প্রয়োজন মেটাতেই মেয়েদের এই চাকরিতে যোগদান জরুরি হয়ে উঠেছিল। সংসারের গণ্ডিতে গৃহিণী এবার শুধু খরচ কমানোর জন্যই নয়, আয় বাড়াবার দিকেও চেষ্টা করল। যার ফলে বিপরীত চিন্তাধারার মানুষদের সঙ্গেও একটি মানসিক টানাপোড়েনের অন্তঃপ্রবাহ ধরা পড়ে।

জীবন সংগ্রামের নিরিখে 'অবতরণিকা' গল্পের সুব্রত-আরতির অবস্থান বিশেষ উন্নত ছিল না। দেশভাগের পর সুব্রতর বাবা-মা ও তিন ভাইবোন কলকাতায় চলে এলে তাদের দায়িত্ব নিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। তবে আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। গল্পের সূচনা আরতির অফিস থেকে দেরি করে ফেরা নিয়ে উদ্‌বেগ ও অসন্তোষের মধ্য দিয়ে।

একদিন সুব্রতর উৎসাহেই আরতি চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরতির কথায় 'কমার্শিয়াল গন্ধ' অনুভব হয় সুব্রতর। কর্মব্যস্ততার জন্য আরতির মনের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে মানিয়ে নিতে পারে না তার স্বামী। বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রকাশ করে অভিযোগ। নালিশ করে আরতির বাবার কাছেও। কিন্তু চাকরি ছাড়তে রাজি হয় না আরতি। আরতির স্বতন্ত্র চিন্তাকে শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন বোধ করেনি সুব্রত।

গল্পে ব্যাঙ্কফেলের ঘটনাও সমসাময়িককালের এক সমস্যাকে আশ্রিত করেছে। সংকট যখন চরমে, তখনই সুব্রতর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। প্রকট হয় চরম অর্থাভাব। সময়ের সাথে যুঝে যখন আরতি নিতান্তই ক্লান্ত, সে সময় আবার সুব্রত সচেতন হয়ে ওঠে আরতির চাকরির নিরাপত্তা-বিষয়ে। সুব্রতর আর্থিক চাপকে লাঘব করার উদ্দেশ্যে একদিন আরতি এগিয়ে এসেছিল কিন্তু আরতির আত্মিক চাপকে বহন করতে উদাসীন সুব্রত। আরতির প্রত্যাশা নষ্ট করে সুব্রতর এই দুর্বল সুবিধাবাদীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের স্খলনই 'অবতরণিকা'র বিষয়।

দেশভাগের বিপর্যয়ের পর জীবিকার তাগিদে এদেশে এসে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে চাকরির প্রতিযোগিতা অন্যতম স্পর্ধা হয়ে দাঁড়ায়। 'চাকরি' গল্পে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায় সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট নীলাম্বর চাকরিসূত্রে উদয়ন প্রেস আর পাবলিকেশনে নিযুক্ত। কিন্তু এরই ফাঁকে প্রেমিকা মাধবীর সঙ্গে জব্বলপুরে প্রমোদভ্রমণে যাওয়ার জন্য নীলাম্বরের চাকরি চলে যায়। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে পরিবারের অর্থসংস্থানেও। বেকারত্বের এই আক্রোশ পড়ে মাধবীর ওপর।

নীলাম্বরের বাবার মতে গরিবের সংসারে বিয়েই ভালো, প্রেমটাই সাংঘাতিক। কেননা তাতে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। বলতে অপেক্ষা রাখে না যে চাকরিবিহীন এই দুর্দিনে বাবার এই অভিমতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন নীলাম্বরের। অভাবের তাড়নায় নীলাম্বরের সাহিত্যচর্চাও একপ্রকার হারিয়ে গেছে। পাঠকের চাহিদা অনুসারে সম্পাদক তার কাছে একটু সরস লেখার আবেদন জানালে সে বলে— "সরস লেখা! জীবনে রস কই যে কলমে রস আসবে!"

নীলাম্বরের জীবনে প্রধান কাঙ্ক্ষিত বস্তু— একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর অবকাশ। এদিকে নীলাম্বরের ব্যর্থতা ক্রমে দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে উঠেছে মাধবীর জীবনে। প্রণয়ের জোর শক্ত হলেও শুভ পরিণয়ের সূচনা হয়ে ওঠেনি সেজন্যই। ইতিমধ্যে নীলাম্বরের ছোটখাটো প্রয়োজনে নিজের চাকরির আয় থেকে যথাসাধ্য করেছে মাধবী। কিন্তু এবার নীলাম্বরের বেকারত্ব ঘোচানোর দায়ভার পরে মাধবীরই কাঁধে।

আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও পরিচিত কোনো ব্যক্তিকেই একটি চাকরির তোষামোদ করতে বাদ রাখল না সে। অবশেষে মাধবীর মামাতো বোন নীলিমার স্বামীর সহযোগে অনেক অনুনয়ে তাদের ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানিতে একটি চাকরির ব্যবস্থা হয় নীলাম্বরের। মাধবীর স্বপ্ন সত্যি হলেও অদ্ভুত ঘটনাচক্রে তার সহপাঠী অসিতের স্বপ্ন ভঙ্গের আভাস পাওয়া যায় গল্পে। মাধবীর সঙ্গে নীলিমার সম্পর্ক অবগত হয়ে অসিত তার একান্ত দুর্দিনে ওই একই চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানায় মাধবীকে। একদিকে নিজের বিয়েকে নিরাপদ করার স্বার্থপর প্রয়াস, অন্যদিকে মানবিকতার দংশন মাধবীকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। চূড়ান্ত স্বার্থপরতা কিংবা স্বার্থত্যাগ কোনোটিতেই তার প্রবৃত্তি নেই। তাই চাকরি পাওয়ার উল্লাসে সত্যিই যখন শেষপর্যন্ত নিজে থেকে নীলাম্বর বিয়ের প্রস্তাব দেয় মাধবীকে, তখন তার বেপথু মন আর কিছুদিন অপেক্ষার কথা জনায়

নীলাম্বরকে। অন্তত অসিতের চাকরি হওয়া পর্যন্ত। নীলাম্বরের মনেও আশ্চর্য এক বোধ তাকে ক্ষত করল— এ চাকরির প্রয়োজন তার অপেক্ষা অন্য কারো বেশি ছিল।

'অভিনেত্রী' গল্পে ডিরেক্টর অনিমেষের কথায় বিনয় কলকাতার ভাড়াবাড়িতে বাসা বেঁধেছে। অর্থাভাবে সংসার চালানো বিনয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাই দাম্পত্য কলহ লেগেই আছে বিশেষত রুগ্‌ণ শিশুর পথ্যের অভাব তার এই দারিদ্র্যকে আরও ঘনিয়ে তুলেছে। কিছু অর্থসংস্থানে সুবিধার জন্য অনিমেষকে সিনেমায় পার্ট দেওয়ার কথা বিনয় অনুরোধ করলে তার পরিবর্তে বিনয়ের স্ত্রী লাবণ্যকে রুগ্ন সন্তানের জননীর পার্টটি দিতে রাজি হয়। বিজ্ঞাপনের সুবিধায় আর ব্যয়ের মাত্রাটা একটু কমানোর উদ্দেশ্যে পেশাদার অভিনেত্রী মালতীর বদলে লাবণ্যকে ছবির এ অংশে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরিবর্তে অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে সহজেই দর্শকদের প্রলুব্ধ করা যায়,

> নিজের ছেলে নিয়ে ভদ্রঘরের সুন্দরী কুলবধূ অভিনয়ে নেমেছেন বইয়ের পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে![৫]

বাস্তব যতই কঠিন আর সত্য হোক ছবির পর্দায় তাকে উপভোগ্য করে না-সাজালে যেন ঠিক সফল হওয়া যায় না। ছবির সেটে লাবণ্যর নিত্য বাস্তবকে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শাতে গিয়ে অসমর্থ হল সে। যে সন্তানের রুগ্নতার জ্বালায় মা জর্জরিত, পেশাদারি মঞ্চে তার সফল অভিনয়ে সে অক্ষম। তার স্থানে চুটিয়ে অভিনয় করে চোখে জল এনে দিল যৌনকর্মী মালতী মল্লিক।

লাবণ্যের দারিদ্র্যের সংসারে তার বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইতে এলে লাবণ্য স্বামীর দাস্ত বমির কাল্পনিক অসুখের কথা নিখুঁত অভিনয় সহযোগে শোনায়। অনিমেষের উপস্থিতিতে লাবণ্যের এই অভিনয় তাকে নিঃসন্দেহে অবাক করে, কিন্তু সেদিন অভিনয়ের মঞ্চে কী করে ঘাবড়ে গেল সে তা জিজ্ঞেস করায় লাবণ্য অদ্ভুত হেসে উত্তর দেয় যে মালতীরও সাধ্যে কুলোত না, তার জায়গায় সে থাকলে সেখানে ঘাবড়ে যেত। লাবণ্যের ঠোঁটের কোণে হাসি থাকলেও চোখ দুটি ছলছল। জীবনে বেঁচে থাকার এই অন্য পরিচয়ে সহজেই মনকে সমবেদনাময় করে তোলে।

'হেডমাস্টার' গল্পে কঠিন জীবন সংগ্রামের ছাপ প্রৌঢ়ত্বকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। পাকিস্তান হওয়ার পর যখন ওদেশ ছেড়ে একে একে লোকেরা এদেশমুখী হয়, তখন নিরুপায় বৃদ্ধ হেডমাস্টারকে ছেলেদের ভরণ-পোষণের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত দেশ আর মাস্টারি দুই-ই ছেড়ে আসতে হয়।

দেশভাগের পর পরিণত বয়সে বাধ্য হয়ে কলকাতায় এসে স্ত্রীর সুপারিশে প্রাক্তন ছাত্র নিরুপম নন্দীর কাছে চাকরির খোঁজ করেন। জীবনের তিক্ত স্বাদ তাকে মাস্টারি চাকরিতে বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাতে এই মাস্টারিই তার শিরায় প্রবাহিত। তাই ছাত্র নিরুপম যখন ব্যাঙ্কের চাকরিতে তাকে নিযুক্ত করলেন, সেখানে কোনোরকম প্রগলভতা, অন্যায়, ভুল ইংরেজি ইত্যাদি সহ্য করতে পারেন না— তাই অভ্যাসবশে সকলকে ধমকান। সব ডিপার্টমেন্ট থেকে ফেরত এসে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের বেয়ারা পদের ভার পেলেন। সন্ধ্যায় দেখা যায় বেয়ারাদের পড়াচ্ছেন হেডমাস্টার, তাদের 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ বোঝাচ্ছেন। কলকাতা শহরে এই ছিন্নমূল প্রৌঢ় মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াই তবু অব্যাহত রেখেছেন।

দেশভাগের পর মধ্যবিত্তশ্রেণির বাঙালির এক বিরাট অংশ শিকারগ্রস্ত বেঁচে থাকার প্রাণপণ প্রয়াস ঠেলে দিয়েছে কঠিন জীবনসংগ্রামের অভিমুখে। শহর কলকাতার বুকে এই অসহায় মানুষদের দিন কেটেছে অতি কষ্টে। 'কাঠগোলাপ' গল্পে এই না-দেখা ফুলটি বেঁচে থাকার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নীরদ ও অনিমার দাম্পত্য-সংসারকে কেন্দ্র করে গল্পে ক্রমশই ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাময় দিনযাপনের চিত্র

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তিবাড়ির দুর্দশা থেকে রাস্তার মোড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অগণিত মানুষের রিলিফ সেন্টার সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য, কখনো-বা ফলের ব্যাবসার পরিচিত বন্ধুকে কুমড়োর ফালি নিয়ে রাস্তায় বসে থাকতে দেখা— এসবই বাস্তুচ্যুত ওপার বাংলার মানুষদের কলকাতায় এসে আপ্রাণ সংগ্রামের গল্প বলে।

প্রথমার্ধে চাকরি থাকাকালীন নীরদের কোনো মতে চলে গেছে। যদিও স্ত্রী অণিমার শহর কলকাতার বিলাসমুখী জীবনের চাহিদা তাকে অতিষ্ঠ করেছে, কিন্তু একদিন যখন অবুঝ স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপে নিরুপায় নীরদের চাকরিটুকু চলে যায়, নেমে আসে চরম আর্থিক সংকট।

অণিমার কলকাতা বিলাসের সম্পূর্ণ বিপরীতে উপস্থাপিত হয়েছে নীরদের বাস্তব কলকাতা। দেশের বাড়ির সবকিছু স্পষ্ট নীরদের স্বপ্নে ও স্মৃতিতে। কিন্তু কঠিন বাস্তব জীবনকে ক্রমশ বিকৃত করে দিয়েছে। নানা দুরবস্থার মধ্যে হাসিমুখে সেলাইয়ের ফ্রেমে কাঠগোলাপ তোলার চেষ্টা চালিয়ে যায় অণিমা।

ঘোর দারিদ্র্যেও নীরদ চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যায়। অণিমাও গানের মাস্টারি, সেলাইয়ের মাস্টারির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে যায়। অবশেষে দেশ পাড়াগাঁয়ের দুই বোনের সহযোগে ঠোঙা তৈরি করে জীবন-যাপনের পাথেয় সংগ্রহ করে। উৎসাহের অভাব নেই তার। স্বামীর কাছে আড়াল রাখলেও একদিন মধ্যরাতে হঠাৎ দুঃস্বপ্নে ভেঙে যাওয়া ঘুম থেকে উঠে এসে ফুলের নকশায় সজানো ঠোঙাগুলি দেখে অবাক হয় নীরদ। সুখের দিনে জীবনের ছোটোখাটো আনন্দ যে কুড়িয়ে নেয় শিশুর সারল্যে, আবার দুঃখের দিনে সংসার বাঁচাতে তার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

দ্বীপান্বিতা ও অসবর্ণা : দেশভাগের ফলশ্রুতি

দেশভাগের ফলে ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষ জীবন ধারণের জন্য কলকাতায় এসে নানাধরনের পেশা অবলম্বন করে। অনেক সময়ই তাদের এই পেশাগত অবস্থান থেকে আত্মপ্রকাশে সংকোচবোধ হয়। 'দ্বীপান্বিতা' গল্পে শিশিরের বাল্যবন্ধু বিনয় কর্মগত সত্যকে উচ্চমানের পেশার ছদ্মে আড়াল করতে চায়। তার এই মিথ্যে সম্ভাবনায় এক প্রেমের বীজকে বিনষ্ট করে দেয়।

দেশভাগের পর হঠাৎ কলকাতার রাস্তায় দেখা বাল্যবন্ধু বিনয়কে নিয়ে আসে। শিশিরের ভাড়া ঘরে বৈদ্যুতিক বিভ্রাট লেগেই আছে। সাংসারিক খরচের সঙ্গে পেরে ওঠা দায় হয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের পেছনে খরচের অবশিষ্ট থাকে না বলে বাড়িতে এই অমাবস্যা। শিশিরের বিবাহযোগ্যা বোন অরুণা বীরেনের জন্য চা নিয়ে এলে হঠাৎ বাড়িময় অন্ধকার হয়ে যায়— সকলের অগোচরে প্রেমের স্পর্শ অনুভব হয় তাদের। প্রকাশ্যে না-এলেও গোপনে একটা ঝড় বয়ে যেতে থাকে। এ ব্যাপারে পারিবারিক কোনো অসম্মতিরও অবকাশ দেখা যায় না।

শৌখিন রুচির বীরেন খুব সহজেই তার প্রকৃত পেশা গোপন করে যায় এবং শিশিরের ঘরের এই বৈদ্যুতিক দুর্দশা নিজেই সে সারাবার ভার নেয়। অবশ্য বুঝতে বাকি থাকে না যে এর আড়ালে আছে অরুণার প্রতি তার আকর্ষণ। অফিস কামাইয়ের মিথ্যে অছিলায় প্রায় দুদিনের পরিশ্রমে শিশিরের ভাড়াবাড়িকে বিনয় আলোকিত করে তোলে বিশেষভাবে। আবার অরুণার ঘরে যত্নে একটি বাড়তি নীল রঙের বেডসুইচও লাগিয়ে দিয়েছে সে। এই একটি দিনের ঘনিষ্ঠতায় দাদার বন্ধু কখন নিজের বন্ধু হয়ে গেল, টেরও পেল না অরুণা।

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে সিনেমার চারটি পাস নিয়ে শিশির তার স্ত্রী মিনতি আর বোন অরুণা সমেত বেরিয়ে পড়ল বীরেনের খোঁজে। অনেক অনুসন্ধানে খোঁজ মিলল বীরেনের অন্ধকার বস্তির এক তালা ঝুলন্ত ঘরের এবং তাকে দেখা গেল এক সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৈঠকখানার ঘরে মই ঠেকিয়ে উঁচু হোল্ডারের ভিতর বাল্ব

বসিয়ে দিতে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বীরেনের প্রকৃত পরিচয়ে হতবুদ্ধি হল শিশির সহ মিনতি ও অরুণাও। বানিয়ে তোলা আত্মপরিচয় শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে পারেনি বীরেন। দুদিকের বাড়িগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতি দীপ্তিমান হলেও বীরেনের অন্তঃপুরের আলো অচিরেই নিভে গেল।

দেশভাগের পর অনেক ছিন্নমূল মানুষই মাথা গোঁজার অস্থায়ী আস্তানা জোটালেও শুরু হয়েছে জীবনের জটিলতার সমস্যা— বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আর্থিক দুরবস্থা যখন চরম পর্যায়ে তখন হিতাহিত বিচার না-করেই অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা টেনে আনে আরও ঘোরতর বিপদ। ভুক্তভোগী হয় পরিবারের সকলে। সামান্য সুখ-স্বপ্নের আশাও দুঃস্বপ্নে ছেয়ে যায়।

পাকিস্তান ত্যাগী উদ্‌ভাস্তু কালীমোহন চক্রবর্তী তার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় সহযোগে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে ভাড়াটে এবং মালিকদের সম্পর্কে অনুকূলতা এলেও আলাপ-পরিচিতি হতে একটু সময় নিল কালীমোহনের মেয়ে অঞ্জলি এবং প্রশান্তের ভাই প্রবীরের মাঝে। পদমর্যাদায় ও অর্থগৌরবে প্রবীর অনেক উচ্চমানের। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার সে। এদিকে দারিদ্রগ্রস্ত বাড়ির শিক্ষিতা মেয়ে অঞ্জলির পক্ষে প্রবীরের প্রকাশ্য প্রেমে সায় দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ তার দ্বিধা, কুণ্ঠা, ভয়। পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে সূচনা হল দুয়ের মাঝে তীব্র অনুরাগের। এক রোমান্টিক মুহূর্তে প্রবীর তার হিরের আংটি অঞ্জলির আঙুলে পরিয়ে দেয়।

প্রেম যখন বহু কষ্টে সম্মতিক্রমে পরিণয়ের দিকে এগিয়েছিল, এমন সময় তহবিল তছরূপের দায়ে কালীমোহনবাবুকে অ্যারেস্ট করা হয়। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। সংসারের আর্থিক দৈন্য ঘোচাতে প্রবীরের বিরুদ্ধে গিয়েই টেলিফোন অপারেটরের কাজে নিযুক্ত হয় অঞ্জলি। প্রবীর নিম্নমধ্যবিত্তের জটিল মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে বলেছে—

> আশ্চর্য এই নিম্নবিত্তের মন, আশ্চর্যতর এদের সম্ভ্রমবোধ।[৬]

সংসারের অর্থাভাবে প্রবীর-প্রদত্ত হিরার আংটিও বন্ধক রাখে অঞ্জলি, যা শোনার পর অবশ্যই প্রবীরের পৌরুষে প্রবল ধাক্কা লাগে। সংসারের প্রবল ভার সহ্য করতে না-করতেই হাবলুর গ্রেপ্তারি অঞ্জলিকে আরও কঠোর করে তোলে। বাস্তবের কাঠিন্য অঞ্জলির জীবনকে নিষ্প্রভ করে দেয়। সম্ভ্রমবোধে প্রবীরদত্ত আংটির বন্ধক কিস্তিতে শোধ দিয়ে পুনরায় প্রবীরের আঙুলেই পরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে প্রবীরের প্রস্তাবকে অস্বীকার করে নিজের জাত্যাভিমান সম্পর্কে প্রবীরকে সে সচেতনও করে তোলে। অঞ্জলি নিজের অসহায় অবস্থা থেকে প্রবীরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেয়। প্রেমের গভীরেও যে স্টেটাস ও ক্ষমতা চোরাভাবে কাজ করে এ গল্প সে কথাই বলে যায়।

শেষকথা

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ— দুভাবেই ভাঙনের ইঙ্গিত নরেন্দ্রনাথের গল্পে স্পষ্ট। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হঠাৎ দরিদ্র হয়ে যাওয়া মানুষ বিপ্লব করেনি, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সংগ্রাম করে গেছে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকে তিনি গল্পে নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

নারীবাদী ভাবনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না-করেও গত শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন বাস্তব চিত্র। যে নারীসমাজ ছিল গৃহজীবনের কুশীলব— তারা বাইরে পা রাখছে। সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে এবং কিছুটা অর্থনৈতিক রাশও চলে আসছে তাদের হাতে। এ ছাড়া দেশভাগের যন্ত্রণাকে দেখাতে গিয়ে 'অসবর্ণা', 'দ্বীপান্বিতা'র মতো গল্পে প্রেমের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে ছিন্নমূল অস্থির জীবনকথা।

কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে ছিন্নমূল হতভাগ্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের পরাজিত ম্লান

মুখের রূপ ছিন্ন ছিন্ন অংশগুলিকে এক আশ্চর্য সংবেদনশীল শিল্পরূপ লেখক দিয়েছেন, যার পরিচয় অজানা জীবনগাথার নানা ঘটনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. অশ্রুকুমার সিকদার, 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২
২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'গল্পমালা' (১-৭ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৯
৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'গল্পমালা', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
৪. শম্পা চৌধুরী (সম্পাদিত), 'প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প: স্বাধীনতার আগে ও পরে', রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ১৩৫
৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

মেয়েদের রচিত বাংলা ছোটগল্পে মেয়েদের অস্তিত্বের সংকট

তপতী দত্ত

> পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বত্র পুরুষের আধিপত্য ; সাহিত্য জগৎটিও দখল করে বসে আছে পুরুষ লেখক। নারী লেখকদের স্থান খুব কম।
> তসলিমা নাসরিন

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সেখানে ষোলোশো শতাব্দীর রামায়ণের অনুবাদক চন্দ্রাবতীকে ছাড়া আর তেমন বিখ্যাত কোনো লেখিকার নাম আমরা পাই না। উনিশ শতকের পূর্বে, এমনকি উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বঙ্গদেশের মেয়েদের ক্ষেত্রে শুধু যে লেখাপড়া শেখার সুযোগের অভাব ছিল, তা নয়, বরং তাদের লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটাও ছিল ঘোর অপরাধের। সেই সময় দাঁড়িয়ে একজন মেয়ের পক্ষে মনে মনে লেখাপড়া করার ইচ্ছেটাও যে ছিল কতটা ভয়ের, তা-ই বোঝাতে গিয়ে সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য' গ্রন্থের ভূমিকায় রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী উল্লেখ করে লিখেছেন— "মনে পড়ে যায় রামায়ণে শূদ্র শম্বুকের তপস্যা করার অপরাধে মাথা কাটা যাওয়ার কথা।"[১] স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার আবশ্যকতা এদেশে চিরদিনই উপেক্ষিত হয়েছে। এমনকি, সকল শ্রেণির পুরুষ জাতির জন্যও এর আবশ্যকতা বোধ ছিল না। বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর এক প্রবন্ধে লেখাপড়া সম্পর্কে, তাঁর পিতামহের আমলে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন।—

লিখনং পঠনং মরণং দুঃখে,
মচ্ছ মারিব খাইব সুখে।
তবে কিঞ্চিৎ লিখনং
বিবাহের কারণং।[২]

এর থেকেই আমরা তৎকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কী ছিল, তার এক সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাই। লেখাপড়ার প্রয়োজন কেন? বিয়ের জন্য। সে সময় কন্যাপক্ষের লোক এসে বরের

দত্ত, তপতী : *মেয়েদের রচিত বাংলা ছোটগল্পে মেয়েদের অস্তিত্বের সংকট*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৮৪-১০৪

হস্তাক্ষর পরীক্ষা করতেন। তার জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আর নারীর "সকল শিক্ষার লক্ষ্য একান্নবর্তী পরিবারের সকলের মন রক্ষা করিয়া চলা, সকলের অধীন হইয়া থাকা, নিজে গৃহের কর্ত্রী না-হওয়া পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব লোপ করিয়া থাকা।... এখানে নারী কী শিক্ষা করে? আত্মসংবরণ, আত্ম-বিলোপ,... এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে অসরলতা বা নীরবতা।"[৩] আর এই সমস্ত গৃহকর্ম সাধনের জন্য যে বিদ্যাশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, এটাই ছিল সেকালের সর্বজনসিদ্ধ ধারণা। তা ছাড়া, সেই সময় মেয়েদের মনে এই ভীতি সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছিল যে, লেখা-পড়া শিখলে তারা বিধবা হবে।

তবে প্রাচীনকালে আমাদের হিন্দু সমাজে নারীজাতি অতিশয় আদরণীয়া ও পূজনীয়া ছিলেন। পবিত্র রমণীদের তখন লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলে গণ্য করা হত। বৈদিক ধর্ম মতে বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি অমৃতের পুত্র। যে সনাতন হিন্দু ধর্ম মানুষের এইরূপ মূল্যায়ন করেছে, সেখানে নারীও যে সমান ঋত্বিকের অধিকার পাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বহু স্তোত্র প্রণয়নে ঘোষা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ সাধ্বী নারীর নাম আমরা পাই। হিন্দুশাস্ত্রে মানুষকে সন্ন্যাসী হয়ে নারীকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়নি; বরং বংশরক্ষার জন্য নারীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আবার সন্তান লাভের পর নারী তাঁর রমণীমূর্তি পরিত্যাগ করে মহীয়সী মাতৃরূপে সংসারের অধ্যক্ষতা করবেন। তাই মনু সন্তান প্রসবিনী মাকে গৃহলক্ষ্মীর সম্মানে অভিহিত করেছেন। তিনি মাতৃগৌরবের কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন এইভাবে— দশজন উপাধ্যায় (ব্রাহ্মণ) অপেক্ষা একজন আচার্য্যের গৌরব অধিক, একশত আচার্য্যের গৌরবাপেক্ষা পিতার গৌরব অধিকতর; সর্বোপরি সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা সম্মানার্হ (মনু, ২/১৪৫)। হিন্দু সভ্যতা ও দর্শনে নারী শুধু মাতৃরূপেই নন, ঈশ্বরীরূপেও উপাস্য বটে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর যে শক্তি বা প্রকৃতির সহায়তায় ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিকেই হিন্দুরা মাতৃরূপে মহামায়ারূপে পূজা করে। হিন্দু মূল্যবোধে নারীর সম্মান রক্ষা করা যে কতটা মূল্যবান, মহাভারতের যুদ্ধই তার প্রমাণ। সেই পুরাকালে আর্য নারীগণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। শুধু ইচ্ছে মতো লেখাপড়া, নাচ-গান শিক্ষার সুবিধাই নয়; যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাজসভা প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানেও আর্য নারীগণ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারতেন। এমনকি সেই যুগের আর্য রমণীরা প্রাপ্ত বয়সে স্বয়ম্বর প্রথায় স্বেচ্ছানুসারে মনোনীত পাত্র গ্রহণ করতে পারতেন।

কিন্তু, হাজার বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু জাতি ও তার সমাজে, ঠিক কবে থেকে, দেবীমূর্তি নারীর অবমূল্যায়ন আরম্ভ হয়েছে এবং নারীগণ নির্যাতিত ও লালসার শিকার হতে শুরু করেছে, তা আমরা যথার্থভাবে বলতে না পারলেও, মোটামুটিভাবে এটুকু বলতে পারি যে, মুসলমানাধিকারের সময় হতেই ভারত-মহিলাকে সতীত্ব রক্ষার জন্য গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ হতে হয়েছে। সেই সময় থেকেই জ্ঞানচর্চার অধিকার হতেও এদেশীয় রমণীরা বঞ্চিত হতে শুরু করে এবং কালক্রমে 'পুরুষের মনোহারিণী ক্রীড়াপুত্তলিকা' সেজে অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহিঃশত্রু আক্রান্ত হিন্দুসমাজে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মের নামে চলেছিল অজ্ঞ-লোভী-বিদ্যাহীন-নীতিহীন-চরিত্রহীন সমাজপতিদের লাম্পট্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহজনিত শোষণ, সহমরণ আদি নারী সমাজের ওপর অকথ্য পৈশাচিক নির্যাতন। এ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'নারী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

> পুরুষ নারীকে গৃহে বন্দী করেছে, তাকে সতীত্ব শিখিয়েছে, সতীত্বকে নারীর জীবনের মুকুট করে তুলেছে, যদিও লাম্পট্যকেই করে তুলেছে নিজের গৌরব। পুরুষ উদ্ভাবন করেছে নারী সম্পর্কে একটি বড় মিথ্যা, যাকে সে বলেছে 'চিরন্তনী নারী'। তাকে বলেছে দেবী, শাশ্বতী, কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মী, অর্ধেক কল্পনা; কিন্তু পুরুষ চেয়েছে 'চিরন্তনী দাসী'।[৪]

এই সময় হিন্দু রমণীদের সম্মানই যে কেবল নষ্ট হয় তা-ই নয়, সমাজের চোখে তারা হয়ে ওঠে ঘোর ঘৃণার পাত্রী। তখন থেকেই পণ্য হিসাবে নারীর স্থান হয় নিষিদ্ধ পল্লিতে। পুরাকালের মাতৃরূপিণী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীর পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় 'নরকের দ্বার'। নারীর ওপরে চালানো হিন্দু পিতৃতন্ত্রের এই নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর হিন্দু পিতৃতন্ত্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে গভীর ক্ষোভে বলেছিলেন,

> যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ্বিবেচনা নাই, ...আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।[৫]

সেকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে-কারণেই ছলে-বলে-কৌশলে মেয়েদের শিক্ষার আলোক থেকে দূরে সরিয়ে অন্তঃপুরের অবহেলা-অপমান-নির্যাতন ও কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় বন্দি করে রাখার চেষ্টা করুক না কেন ; তবু উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী গুপ্ত ও তার কিছুকাল পর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, কৃষ্ণভাবিনী দেবী প্রমুখের মতো কয়েকজন অদম্যমনা বাঙালি নারী নিজেদের একান্ত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ফেলেন। এমনকি, সেই বিরূপতার মধ্যেই নানা পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্রাদি প্রকাশ ও সাহিত্য সৃষ্টির পথেও তাঁরা ব্রতী হন। খুব সীমিত সংখ্যায় হলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেতে থাকে মেয়েদের লেখা চিঠিপত্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে বাঙালি মেয়েরা মুদ্রণ সংস্কৃতিতে মোটামুটি একটা স্থানাধিকার করতে শুরু করেন। তবে এখানে আমাদের এটাও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের সনাতন সমাজ স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী মুক্তির বিরোধিতা করলেও, তারই মধ্যে মিশনারিদের কিছুটা প্রয়াস ও অবশ্যই সেই সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো কিছু দেশীয় সম্ভ্রান্ত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহযোগিতা স্ত্রী-শিক্ষার সেই বন্ধুর পথকে অনেকখানি মসৃণ করে তুলেছিল। উনিশ শতকের প্রথম থেকে যে কয়জন বাঙালি মহিলা সাহিত্যিকের রচনা আমরা পাই, সেখানে তুলনামূলকভাবে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। তবে এরই পাশাপাশি তাঁদের রচিত গল্প, উপন্যাস এবং ভাবনামূলক প্রবন্ধেরও বহু নিদর্শন আমরা পাই।

এই প্রবন্ধে আমরা বাংলা ছোটগল্পের সূচনা পর্ব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কয়েকজন বিখ্যাত নারী-গল্পকারের কিছু গল্প নিয়ে এই গল্পকারদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায়, তাঁদের কলমে ও দৃষ্টিতে, সেকাল ও একালের নারীর বাস্তব চিত্রটি, সমাজে তাদের অবস্থানটি কীভাবে মুদ্রিত হয়েছে তাই দেখার প্রয়াস পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহিলা গল্পকার রূপে পরিচিত স্বর্ণকুমারী দেবী (জন্ম-১৮৫৬)। তাঁর রচিত 'লজ্জাবতী' গল্পে আমরা পাই এক অভিমানী বালিকাবধূর করুণ পরিণতির ইতিহাস। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত অভিমানী মেয়েটি পিতামাতার সামান্য তিরস্কারেই লজ্জাবতী লতাটির মতো সংকুচিত জড়সড় হয়ে পড়ত এবং তার ছোট গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে যেত বলে বাপ-মা আদর করে তার নাম দেন 'লজ্জাবতী'। কিন্তু এই অকৃত্রিম নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জা-মাধুরীই শ্বশুরগৃহে তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ,

> সে তো প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাঁরা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোনো কথা না কহিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে, সে জানে ইহাতেই তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবে।[৬]

কিন্তু কঠোর এই পৃথিবীতে কোমল অশ্রুর মর্যাদা কয়জন দিতে পারে! ফলে যে স্বভাবগুণে লজ্জাবতী তার পিতা-মাতার আদরের ছিল, সেই স্বভাবের জন্যই স্বামীগৃহে প্রতিনিয়ত তাকে তাড়না ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বিয়ের দ্বাদশ বৎসর পরও সে ভোরে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়; হঠাৎ কোনো

একদিন শাশুড়ি একটু বেশি কোমল স্বরে ডাক দিলে চমকে গিয়ে কুটনা কোটার বদলে নিজ আঙুলই কেটে বসে এবং তা কাপড়ে লুকিয়ে স্বভাবিকভাবেই গৃহকর্ম করে চলে। কোনোদিন না দেখা ঠাকুরঝি ফুলকুমারীর আগমনবার্তা শুনে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলে, অতিশয় আনন্দোচ্ছ্বাসের জন্য বড় জায়ের কাছে বকুনি খেয়ে চোখে জল এলেও হাসতে থাকে। এমনই শিশুসুলভ চপলতা তার।

এই লজ্জাবতীর ভাগ্য এমনই যে তার মেয়ে পুটুরানি মাথার ফুলকাঁটা ও ফিতে হারিয়ে ফেললে তার জন্যও মেয়ে, স্বামী ও শাশুড়ির কাছে লজ্জাবতীকেই গঞ্জনা শুনতে হয়। বিনা অপরাধে হওয়া এই তিরস্কারের জন্য সামান্য প্রতিবাদ করার মতো সাহসও তার নেই, কেবল কাঁদা ছাড়া। তার এই সরলতা ফুলকুমারীর হৃদয়কে মমতার্দ্র করে তোলে। সে দেখতে পায়,

> সে (লজ্জাবতী) যেন ছাই ফেলিতে ভাঙাকুলা, তাহাকে জা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্যন্ত বকে— এমনকী মাসীরা (বাড়ির দাসী) পর্যন্ত বকে, তাহার কী দোষ, কোনো দোষ আছে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবারও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না— লজ্জাবতীও কখনো নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।[৭]

ফুলকুমারী তাকে তার এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে লজ্জাবতী বলে,

> কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কীরকম করে বলি, সবাই ভুল বোঝে?[৮]

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়ির ঝি-রা লজ্জাবতীকে রাতে লেপ দিতে ভুলে গেলে সে রাতে ঠান্ডায় কষ্ট পায়, কিন্তু তবু মুখ ফুটে চাইতে পারে না। জ্বর ও মাথা ব্যথা নিয়ে সমস্ত দিন নিস্তব্ধে রান্নাঘরে বসে রান্না করে। আবার এই অসুস্থ শরীরেই বিনা অপরাধে শাশুড়ির কাছে তাকে তিরস্কৃত হতে হয় এই বলে যে, সে নাকি ইচ্ছে করেই জ্বর বাঁধিয়েছে। কিন্তু সে কোনো কিছুরই কোনো প্রতিবাদ করে না। নিজের নির্দোষতাকে প্রমাণের মতো শক্তি বা বুদ্ধিই যেন তার নেই। কেবল, একমাত্র যে ঠাকুরঝি তাকে বুঝতে পেরেছিল, তার সহব্যথী হয়ে তাকে কথা দিয়েছিল— তার ওপর কখনো রাগ করবে না, সে ঠাকুরঝিও যখন তার ওপর রাগ করে তার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, শুধু তখনই দেখি লজ্জাবতীর মনোবেদনা যেন তাকে আছড়ে মারতে চায়। রাতে ঠান্ডা লাগার চেয়েও এই বেদনাই তাকে আরও বেশি অসুস্থ করে তোলে। অতঃপর ফুলকুমারী অসুস্থ লজ্জাবতীকে দেখতে এলে সে রোগশয্যায় শুয়েই ঠাকুরঝিকে প্রশ্ন করে,

> না, আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি, তোমার আর রাগ নেই— তুমিও ভাই আমার ওপর রাগ করলে![৯]

ফুলকুমারী যখন জানাল যে সে আর কখনো রাগ করবে না, তখন আর লজ্জাবতী কোনো কথাই বলে না। ফুলকুমারীর বুকে মাথা রেখে প্রশান্ত সুখে কাঁদতে কাঁদতে জন্মের মতো কাঁদার সাধ মেটায়। আর এর কয়েকদিন পরই সেই রোগশয্যা হতে একেবারে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে।

এখানে আমরা লজ্জাবতীর যে পরিণতি দেখতে পাই তা সত্যিই মর্মান্তিক। আজও আমাদের সমাজে এমন কত নিরীহ মেয়ে যে নিজ মুখ ফুটে নিজ সুখসুবিধার কথা, নিজ অস্তিত্বের কথা বলতে পারার মতো সাহস সঞ্চয় করতে না পারার জন্য অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তা তো আমরা প্রায়ই টিভি চ্যানেলগুলিতে ও সংবাদপত্রে দেখতে পাচ্ছি।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করতে যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, সে ইতিহাস আমরা ভূমিকাংশেই উল্লেখ করেছি। সেকালে লেখাপড়া জানা মেয়েদের, সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, যে অনেক ক্ষেত্রেই কীভাবে লড়াই করতে হয়েছিল নিজেদের অধিকার লাভের জন্য তাই হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন

গল্পকার বেগম রোকেয়া (জন্ম-১৮৮০) তাঁর 'বলিগর্ত' গল্পটিতে। গল্পের নায়িকা কমলাদেবী কংগ্রেস সেবিকা, চরকা ও খদ্দর প্রচার তার ব্রত। তার এক সঙ্গী জাহেদা বেগম নাম্নী মুসলিম মহিলা। এই কমলা ও জাহেদা নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে চরকা ও খাদির প্রচার করতে সফল হলেও অত্যন্ত দুর্গম গ্রাম বলিগর্ত, যেখানে জাহেদার মামার বাড়ি ও যেখানে তার মামাতো ভাইদের রাজত্ব, সেখানে কিন্তু জাহেদার প্রবেশাধিকার নেই। তার অপরাধ, সে কমলা দেবীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একটু লেখাপড়া জানে, খদ্দর পরে, নিরামিষ খায়। তবে তাই বলে কমলা দেবী বা জাহেদা বিবি কেউই হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। কমলা দেবীর মন্তব্য,

> আমি যে কমলা— সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। বিশেষত ওই প্রবেশ নিষেধ বলিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে।[১০]

মেয়েদের এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, স্থান-কাল-সমাজ বিশেষে এর যে খুব তারতম্য ঘটেছে তা আজও আমরা বলতে পারি না। তবে কমলা দেবী ও জাহেদা বিবির মতো কিছু নারীর অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহসই আজকের সমাজে মেয়েদের এতটা স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়তা করেছে। উক্ত গল্পে দেখি, অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে কমলা দেবীরা বলিগর্তের উদ্দেশে যাত্রারম্ভ করলে মাঝপথে জাহেদার এক মাসতুতো ভাই ষড়যন্ত্র করে পথের নানা বাধাবিঘ্নের ভয় দেখিয়ে দেয়, যেমন—

> এখন বলিগর্তে যাইবার কোনো পথ নাই— খানা, ডোবা ইত্যাদি কাদায় পূর্ণ। জল প্রচুর নহে বলিয়া নৌকা চলিতে পারে না। পথ শুষ্ক এবং সমতল নহে বলিয়া পালকি ও মোটর চলিতে পারে না। পথের কোন স্থান আবার পাহাড়ের মতো উচ্চ। ...আপনারা পথের কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবেন না। আর যদি বহু কষ্ট করিয়া যান, তবে থাকিবেন কোথায়?'' এবং নানা আজগুবি গল্প শুনিয়ে তাদের সেখানে যাওয়া থেকে বিরত করে। তখন বাধ্য হয়ে সেই মাঝপথ থেকেই জাহেদা, কমলারা ফিরে আসে। কিন্তু তথাপিও তারা নিরাশ হয় না। বরং ফেরার জন্য গাড়িতে উঠতে গিয়ে বলে, ''আচ্ছা দাদা। অপেক্ষা করুন। বলিগর্তে যাইবার পথ যদি ধরাধামে না পাই, তবে কিছুকাল পরে আমরা এরোপ্লেন যোগে আসিয়া একেবারে খাঁ বাহাদুর মিষ্টার কশাই উদ্দিন খটখটের দোতালায় ছাদের উপর নামিব।''[১১]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর (জন্ম-১৮৯৪) 'দর ও দস্তুর' গল্পে রয়েছে পণ প্রথার কথা। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা পণ প্রথার ইতিহাস সম্পর্কে কম-বেশি আমরা সকলেই অবগত। পণ প্রথার করুণ পরিণামাবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' থেকে আরম্ভ করে আরো অনেক গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'দর ও দস্তুর' গল্পে পণ প্রথার পাশাপাশি এসেছে আমাদের সমাজে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার পূর্বে মেয়ে দেখার নামে যে এক প্রহসনানুষ্ঠিত হয় তারও এক নিখুঁত বর্ণনা। গল্পের নায়িকা নিভা। শ্যামবর্ণ। সেকেন্ড ক্লাসাবধি পড়ার পর স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা তাদের বাড়িতে নেই। এই নিভার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। সে উপলক্ষে পাত্রপক্ষের থেকে ধাপে ধাপে লোক এসে তার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কেউ ওকে দিয়ে বাংলা-ইংরেজি লেখায়, কেউ গান গাওয়ায়, কেউ আবার হাঁটিয়ে দেখে! এরকম আরও কত কী। প্রতিবারই

> বেশি করে সাবান স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতো করে, শাড়ির সঙ্গে জামার রঙ মিল করিয়ে[১২]

পুতুলের মতো সেজেগুজে নিভাকে এ নাটকাভিনয়ের জন্য পাত্রপক্ষের সামনে গিয়ে বসতে হয়। আর পাত্রপক্ষের লোকেরা তার সম্মুখেই তার কালো বর্ণের ইঙ্গিত দিয়ে, উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে তার মাতা-পিতাকে

জানিয়ে যায়, এই কালোকে ফর্সা করার মোক্ষম দাওয়াই— রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা!

ষোল বছরের নিভা ; সে প্রচুর গল্প-উপন্যাস পড়েছে ; কল্পনা করেছে 'কাব্য-জাগতিক আদর্শ স্বামী'র। তার মতে, এভাবে প্রতিদিন পাত্রপক্ষের লোকেরা এসে পাত্রীর রূপ-গুণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ও তারপর ভুরিভুরি পণ নিয়ে বিয়ে স্থির করার মতো অপমানকর আর কিছু নেই এক মেয়ের পক্ষে। এই অপমানে নিভার চোখে জল আসে। সে ভাবে,

> ওরা নাকি সভ্য, ওরা নাকি সব বিদ্বান। ওদের বোনকে এরা কেউ এমনই করে দেখে![১৩]

কিন্তু নিভার এই মনোভাব, এই অপমান-অভিমানবোধ কারো কাছে বোধগম্য নয়। আসলে আমাদের সমাজে এই সমস্ত প্রথা দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হতে হতে আজ তা আমাদের রক্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, কুসংস্কার মুক্ত, পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছেও এ সমস্ত কিছু অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। আর যে নারীসমাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে, শতশত বছর ধরে নরাধীন সমাজে পদদলিত হয়ে থাকতে থাকতে তাদের অনুভূতি এতটাই লোপ পেয়েছে যে, এর মধ্যে কোনো হীনতারই পরিচয় দেখতে পায় না এই নারীদের নব্বই শতাংশই। তাই নিভার মেজদি নিভাকে কাঁদতে দেখে হেসে বলে, "ওরে এ দুঃখ সবারই করতে হয় রে, তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন।" তার দিদির মতে এইভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীঘর করতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়াটাই যেন এক নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়। এরকম করতে হয়েছিল বলে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির অন্য কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই নিভার মেজদিদির। কারণ, তার মতে—

> এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।[১৪]

এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় তসলিমা নাসরিনের করা একটি মন্তব্য,

> সংসারে নারীর মূল্যহীনতার জন্য কিছুটা অংশে দায়ী নারীও। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে মেয়েদের ওপর নিষ্পেষণ চালায় তার সহায়ক এক শ্রেণির নারীই। কারণ এই নারীদের মস্তিষ্কে অণুতে অণুতে সহস্র বছর ধরে প্রবেশ করানো হয়েছে এই শিক্ষা, যে, পুরুষ উপরে, নারী নীচে। পুরুষ খানিক বেশি মানুষ, নারী খানিক কম মানুষ, পুরুষ সুপিরিয়র, নারী ইনফিরিয়র। নারী হচ্ছে পুরুষের সম্পত্তি, পুরুষ যা কিছুই আদেশ করবে, নত মস্তকে নারীর তা পালন করা কর্তব্য।[১৫]

এই গল্পেও সবচাইতে ভয়ানক উক্তিটি আমরা শুনতে পাই নিভার মায়ের মুখে। তিনি অসম্মান, সম্মান, অপমান এ সবের কিছু বোঝেন না। তবে বার বার নব অভিজ্ঞতায় একই অভিনয় দেখেছেন। তাই তিনি নিভার ব্যবহারে সবিস্ময়ে বলেন,

> চিরকালের জিনিস তারা নিয়ে যাবে— দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন।[১৬]

অর্থাৎ, মেয়েরা যেন মানুষ নয়, তারা যেন থালা-ঘটি-বাটিরই মতো, যা কেনার আগে ভালো করে যাচাই করে দেখে নেওয়া উচিত, যাতে পাছে ঠকতে না হয়। আর মেয়েরা! তাদের তো মন বলেও কিছু থাকতে নেই! থাকতে নেই তাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা। তাই নিভা যখন তার মেজদিদিকে জিজ্ঞেস করে যে, যে-বাড়ির লোকেরা তাকে দিয়ে বিয়ের আগে এমন উদ্ভট সব কার্য করিয়েছিল, যে-বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে তাদের মনোমালিন্য হয়েছিল, যে-বাড়ির লোকেরা তাদের বাবাকে অপমান করেছিল, ও সব দেখেও যে-বিদ্বান ছেলে মুখ বন্ধ করে ছিল, সেই ছেলেকে স্বামী হিসাবে তার ভালো লেগেছিল কি না; তখন তার এই প্রশ্নে মেজদিদি একেবারে অবাক হয়ে যায়—

> মেজদিদি হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভালো লাগবে না? কেন? শোন একবার মেয়ের

কথা! হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও! মাগো, ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব, কই, এসব কথা তো ভাবেওনি![১৭]

অর্থাৎ স্বামী, সে যেমনই হোক না কেন, তথাপি বিনা বাক্য ব্যয়ে, তাকে ভালোবাসাটাই যেন আমাদের সমাজের মেয়েদের একমাত্র ভবিতব্য। আর তাই নিভা যখন তার মা-কে বলে

আমার ওরকম করে বিয়ে দিয়ো না মা।... ওই কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালোবাসতে পারব না।[১৮]

তখন তার মা প্রত্যুত্তরে বলেন— শোন কথা। ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কী? পাগল আর কী! এঁরাও (অর্থাৎ নিভার বাবার বাড়ির লোকেরাও) তো টাকা নিয়েছিলেন!

তাঁর নিজের ভালোবাসার কথা মা আর বললেন না।[১৯]

তা যেভাবেই বিয়ে হোক না কেন, বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীকে ভালোবাসতে যে ব্যাঘাত হয় না, এর যে মোক্ষম দৃষ্টান্ত এবার নিভার মা দিলেন, তার জবাব দেওয়ার উপায় আর নিভার নেই। অতঃপর নিভার বাবা ও মা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে, প্রয়োজনে একটু বেশি খরচ করে, সামনের বৈশাখেই উল্লেখিত পাত্রের সঙ্গে নিভার বিয়ে দিয়ে দেবেন।—

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়। ...তাই দেব আর কি। ছেলেটি ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, বাপের অবস্থা ভালো, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাটি দেবে, আদরও করবে।[২০]

ইতিপূর্বে নিভার মাকেও দেখেছি, নিজের বোন, যার বিয়েতে যৌতুকের গয়নার ওজন কম হওয়ায় পাত্রপক্ষের লোকেরা গণ্ডগোল বাঁধিয়েছিল, তার কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনেই বলে, বিয়েতে পাত্রপক্ষের লোকেরা যেরূপ আচরণই করুক না কেন,

আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে। ছেলে-মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘরবাড়ি হিরে মুক্তা![২১]

এখানে আমাদের ভেবে অবাক হতে হয় যে, আমাদের এই দেশেই একদিন সমস্ত ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে মৈত্রেয়ী দেবীর মতো এক নারী দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "যোনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।" আবার ১৩১০ বঙ্গাব্দে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'আমাদের অতি প্রিয় অলংকারগুলি— এগুলি badges of slavery। ঐ দেখো কারাগারে বন্দীগণ লৌহনির্মিত বেড়ি পরিয়াছে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ি পরিয়া বলি 'মল পরিয়াছি'। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত 'চুড়ি'। বলাবাহুল্য অনেকে এক হাতে লোহার বালাও পরেন। কুকুরের গলায় যে dog collar দেখি, উহারই অনুকরণে আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি 'হার পরিয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকা দড়ি' পরায়, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরাইয়াছেন।"[২২] অথচ আজ একবিংশ শতকে পা দিয়েও শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হয়েও, আজও আমাদের মধ্যে একশ্রেণির নারী ও পুরুষের ধারণা অলংকারই নারীর প্রধান ঈপ্সিত বস্তু এবং এতেই তার চরম সুখানন্দ।

রাধারাণী দেবীর (জন্ম-১৯০৩) 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদবুদ' গল্পে আমরা পাই এক একগুঁয়ে জেদি মেয়ে বিন্দুর জীবনকাহিনি। এই 'পাগলি মেয়ে'র 'তেজ' তার বাবার সমর্থন পেলেও, তার মায়ের দুশ্চিন্তা বিরাগের কারণ। সেজোমেয়ে বিন্দুর ওপর তার মা যে এতটা অপ্রসন্ন, তার প্রধান কারণ, শৈশবে জ্ঞানবুদ্ধি

হওয়ার পর থেকে কেউ কখনো খোশামোদে ভুলিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে কার্যসিদ্ধি করে নিতে পারেনি এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি একজেদি বিন্দুর কাছে। তা ছাড়া, বিন্দু যেমন কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না, তেমনি ফাঁকি সহ্য করতেও পারে না। মুখে কিছু না বললেও, বিন্দু যে সবই বুঝতে পারে এবং তাই তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে তার মাকেও মাঝে মাঝে অস্বাচ্ছন্দ্যে পড়তে হয়, তাই বিন্দুকে তার মায়ের এত অপছন্দ। এই বিন্দুর অল্পবয়স থেকেই তার মা-কে তার সম্পর্কে বলতে শুনি—

> কপালে অনেক দুর্গতি আছে। মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতো নরম-সরম হবে, তা নয়কো, সবেতেই পুরুষের সঙ্গে সমান হতে চাওয়া।... অতো তেজ ভালো নয়।... নিজের স্বভাব দোষে ওকে কষ্ট পেতে হবে।... স্বভাব শোধরালে নিজেরই ভালো, না শোধরায় নিজেই জ্বলেপুড়ে মরবে।[২৩]

'মেয়েমানুষ'— এই তকমাটাই হচ্ছে আসলে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় কাল। এক ছড়াতে কোন এক গ্রাম্য কবি লিখেছিলেন— "মেয়েছেলো মাটির ঢেলা, ইচ্ছে হলেই ধপাস করে জলে ফেলা।" মেয়েমানুষ যেন মানুষ নয়! তারা যেন অন্য কোনো জীব। এই মেয়েমানুষের তকমা পরিয়েই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্ত্রীজাতিকে সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে এই বলে যে মেয়েরা দুর্বল, তাদের বুদ্ধি নেই, শক্তি নেই। তাই তাদের স্বাধীনতা দিলে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। তাদের হাতে সামাজিক অধিকার ও গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলে তারা অচিরেই সমাজ-সংসারের বিনাশ করবে। ইত্যাদি অজুহাত দিয়েই আমাদের সমাজে নারীদের দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করে ঘরের চার দেওয়ালে গৃহকর্মের বেড়াজালের দ্বারা আবদ্ধ করে রাখত। আর এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতিবাহিত করতে করতে আমাদের দেশের নারীরাও ভাবতে শুরু করেছিল কেবল নরাধীন হয়ে গৃহকর্ম করে যাওয়ার জন্যই বুঝি তাদের জন্ম হয়েছে।

> এমনই তো জীবন নারীর। গণ্ডির বাইরে বেরোতে গেলেই পায়ে শেকল পরানো হয়। স্বাধীনতার উড়াল চাইলে ডানা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। চোখ ফুটলেই চোখ অন্ধ করা হয়, মুখ খুললেই মুখে কলুপ এঁটে দেওয়া হয়। অধিকারের বোধ জাগলেই তাকে বোধহীন স্তব্ধতার বিষ-জালে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নারীবাদী লেখক ভার্জিনিয়া উলফ নারীর নিজের জন্য একটি ঘরের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। সেই থেকে দিন পেরোচ্ছে,... কিন্তু নিজের ঘর বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া হয়নি নারীর। পাওয়া হয়নি এখনো সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ, সত্তার স্বাতন্ত্র্য, সম্পূর্ণতা। এখনও নারী মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায় না। এখনও তারা দাসী। এখনও বস্তু, ভোগের বস্তু।[২৪]

এই গল্পেও দেখি, লেখাপড়ায় অত্যন্ত উৎসাহী, তীক্ষ্ণ মেধা ও এইসবের জন্য শিক্ষিকাদের অতি প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বিন্দুর বারো বছর হতে না-হতেই তাকে স্কুল ছাড়াবার জন্য তার মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কারণ মেজোমেয়ের পর এবার বিন্দুর বিয়ের পালা। বিন্দু ভয়ংকর আপত্তি জানাল স্কুল ছাড়তে। কিন্তু বিন্দুর কোনো আপত্তিই টিকল না তার মার কঠিন এই যুক্তির কাছে যে—

> ইস্কুলে পাঠিয়েই বা লাভ কী? পড়ে তো জজ-ব্যারিস্টার হবে না? বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন, জীবন তো কাটবে সংসারের ধামা কুলো হাঁড়ি কলসি আর ছেলের দুধের ঝিনুক কাঁথা নেড়েচেড়ে! তা সে রাজার ঘরেই বিয়ে হোক বা গেরস্থ ঘরেই হোক! দোয়াত কলম খাতা বই নিয়ে মেয়েমানুষের জীবন কাটে না।[২৫]

বিন্দুর বাবার ক্ষীণ আপত্তি ও বিন্দুর অনেক কান্নাকাটি, মান-অভিমান সত্ত্বেও বিন্দুর আর স্কুলে যাওয়া হল না। বিন্দুর মনে পড়ল একদিন তার অনিচ্ছায় কীভাবে জোর করে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল ; আর এবারও তার অনিচ্ছাতেই জোর করে তাকে স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল। এটা তার জীবনে প্রথম নয়। "তার প্রতিদিনের সহস্র ওজর আপত্তি ও কান্না ঠিক এমনিভাবেই অভিভাবকদের অটল ইচ্ছার কাছে উপেক্ষিত ও ব্যর্থ হয়েছিল। আজও সেটা কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি, অবিকৃতই আছে দেখে সে বিস্মিত হল না, শুধু এইটুকু বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল, তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনোকিছুরই দাম নেই তার জীবনে।"[২৬] ইতিমধ্যে আরও একদিন বিন্দু তার ছোট বোন ইন্দুকে কিনে দেওয়া বেনারসি সুটের মতো একটা সুট দাবি করে মার কাছে অত্যন্ত তিরস্কৃত হল হিংসুক বলে এবং সেদিনই লজ্জায়-ঘৃণায় সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল— জীবনে কখনো সে আর কারুর কাছে আবদার করে কিছু চাইবে না! যতই তা তার ন্যায্য প্রাপ্য হোক না কেন।

বিন্দুর স্কুলের পাট ঘুচে গেলে, জেদ করে সে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াও ছাড়ে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, তার মনোদুঃখ কিছুটা লাঘব হলে সে নিজে নিজেই পড়াশোনা করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে এলাহাবাদে সুবিধে না হওয়ায় বিন্দুকে কলকাতার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিন্দু তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছের কথা জানিয়ে বাবার কাছে বিয়ের জন্য আপত্তি করলে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে, কলকাতাতেও সে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিতে পারবে। আর পরীক্ষার আগেই যদি বিয়ে হয়ে যায় তবে, বিয়ের পরই শ্বশুরবাড়িতে না পাঠিয়ে, এলাহাবাদে এনে তার বাবা তাকে পরীক্ষার সুযোগ করে দেবেন। কলকাতায় গিয়ে কিন্তু মামাবাড়ির পরিবেশের মধ্যে বিন্দুর আর লেখাপড়া হল না। তবে অল্পকালের মধ্যেই বিন্দুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এবং এলাহাবাদ থেকে তার বাপ-মা-ভাই-বোনেরা এসে তার আপত্তি সত্ত্বেও তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর বিয়ের পর যেহেতু সে অন্যের 'জিনিস' হয়ে গেছে, তাই শ্বশুরবাড়ির থেকে অনুমতি না দেওয়ায় তার বাপ-মা-রা তাকে স্বামীর ঘর করার জন্য শ্বশুরবাড়িতে ফেলে রেখে এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। এবার কিন্তু বিন্দু একটুও জিদ করল না, একফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। কারণ, একান্ত ইচ্ছা বিফল ও একান্ত অনিচ্ছাই সফল হওয়া— এই তো সে জ্ঞানাবধি নিজের জীবনে ঘটে আসতে দেখেছে। তাই এবারও তার ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াটা তার কাছে অতি স্বাভাবিকই ঠেকল বোধহয়।

ম্যাট্রিক এগজামিন দেওয়ার স্বপ্ন একেবারে ঘুচে গেছে। দেখতে দেখতে বিয়ের সাত-আট মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই বধূজীবনকেই এখন বিন্দু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং নিরলস লক্ষ্মীবধূ হয়ে, ঘোমটা টেনে বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর থেকে আড়াই বছরের দুরন্ত ভাসুরপোটি ও বাড়ির পুরনো ঝি-টির পর্যন্ত মন জুগিয়ে চলে অচিরেই সকলকে তার গুণে মুগ্ধ করে দিল। আর মাঝে মধ্যে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কলকাতার হস্টেল থেকে আসা স্বামীর ভালোবাসা পেয়ে তার পূর্ব জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত অপ্রাপ্তিই যেন সে ভুলে গেল। কিন্তু শৈশবাবধি যার জীবনের কোনো স্বপ্ন কোনো ইচ্ছাই পূরণ হয়নি, এবারকার এই অযাচিত সুখলাভও তার কপালে সইল না বড় অধিক দিন। হঠাৎ একদিন নিতান্ত অতর্কিতেই এল তার বিধবা হওয়ার খবর। বিয়ের বছর পার না হতেই, বয়স পনেরো বছরও না হতেই কপাল পুড়ল হতভাগীর। এবারও বিন্দুর চোখে জল এল না। কেবল বজ্রাহতের ন্যায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল সে। কিন্তু যখন এক বিধবা পিসশাশুড়ি তাকে স্নান করিয়ে বিধবায় রূপান্তরিত করার কঠিন কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে এলেন, তখন কিছুক্ষণ পিসশাশুড়ির সেই বৈধব্য বেশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেঁদে উঠে বিন্দু প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে বলতে লাগল—

আমি বিধবা হতে পারব না,— আমায় ছেড়ে দাও পিসিমা! আমায় তোমার মতন করে দিয়ো না,— আমি এমনই থাকব।[২৭]

কিন্তু হায়! যেদিন তার সিঁথিতে সিঁদুররেখা এঁকে, সুন্দর শাড়ি ও গহনায় তাকে সাজানো হয়েছিল— সেদিন যেমন তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা খাটেনি, তেমনি এবারও যখন তার নিরাভরণ অঙ্গে সাদা থান পরিয়ে এক নতুন সাজে নতুন জীবনে হাঁটতে তাকে বাধ্য করা হল, তখনও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। বৈধব্যের বোঝা তার ঘাড়ে চাপানো হল এই যুক্তি দেখিয়ে যে, "এই বোঝা নাকি স্বয়ং ভগবানের মারফত এসেছে!"

এবার আর কোনো প্রতিবাদ বা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করে বিন্দু নিঃশব্দে কঠোর আচারে বৈধব্য পালন শুরু করল। অকপট অন্তরে অখণ্ড মনোযোগে নানাবিধ ব্রতোপবাস, নির্জলা একাদশী, হবিষ্যান্ন আহার করতে লাগল। মেঘের মতো চুলের রাশ নিঃশেষে কেটে ফেলল। পরনে রইল শুধু একখানি থানধুতি মাত্র। তার এই কঠিন আচারনিষ্ঠা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে অনেকেই আপত্তি করে বলল, এখন থেকেই এত কেন? ক্রমে ক্রমে আচার পালনের অভ্যাস করলেই তো হল। কিন্তু বিন্দু এসবের কোনো উত্তর দেয় না, কেবল কঠিন হাসি হাসে। কারণ এবার সে তার ভাগ্য পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। সে মনে মনে স্থির করেছে, এখন থেকে সে প্রকৃতপক্ষে যা কামনা করে, ঠিক তার উল্টোটাই চাওয়ার অভ্যাস করবে। সে দেখতে চায় তার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েও সার্থক হয় কি না! সে দেখতে চায় এবার কার ইচ্ছের জয় হয়! নিজেকে কষ্ট দিয়ে সে মনে মনে ভাবে— এর কর্তা কে? ঈশ্বর না মানুষ? ভিড় করে আসে তার মনে একের পর এক প্রশ্ন চিহ্ন—

জীবনটা আমার নিজের, সুখ-দুঃখ ভোগ করব আমি, অথচ এর নিয়ন্তা অন্য সকলে! এর অর্থ কী? আমার ভালোমন্দ শুভাশুভের দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন? দুঃখ যদি ভোগ করতেই হয়, নিজের হাতেই তা গ্রহণ করব, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব,— অন্যে কেন তার নিয়ন্তা হয়?[২৮]

তবে এই প্রশ্ন কেবল বিন্দুর একার নয়। এ প্রশ্ন আমাদের দেশের সমস্ত পরাধীন নারীজাতির, বিন্দু যার একজন প্রতিনিধি। নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে জেগে ওঠা এই মানসিক দ্বন্দ্বের জন্যই তো পরাধীন নারীজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। নিজ জীবন পরিচালিত করতে চেয়েছে নিজ ইচ্ছায়, তাতে সুখ বা দুঃখভোগ যা-ই হোক না কেন; তবুও পেতে চেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ (অবশ্য এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়)। আমাদের এই গল্পের সমাপ্তিতেও দেখি—

এই পনেরো বছর বয়সেই সমস্ত অন্তর তার যেন কারুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়! — সে মানুষই হোক— ভগবানই হোক— সমাজই হোক— নিয়তিই হোক—।[২৯]

এই গল্পের প্রারম্ভে আমরা পেয়েছিলাম 'মেয়েমানুষ' শব্দটি। আশালতা সিংহের (জন্ম-১৯১১) রচিত একটি ছোটগল্পের নামই হচ্ছে 'মেয়েমানুষ'। মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষ মাত্র, তার অতিরিক্ত আর কিছু নয়— এটাই হল এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে দেখি, স্কুল-কলেজে ভালো ছাত্রী বলে খ্যাত ললিতার বিয়ে হয় এমন এক মস্ত জমিদার বাড়িতে যাদের কোনো টেস্ট নেই। এমন কলেজে পড়া মেয়েরও কোনো প্রয়োজন ছিল না তাদের বাড়িতে। তবে প্রতিবেশী জমিদার বাড়ির সঙ্গে 'টেক্কা' দেওয়ার জন্যই তাদের ম্যাট্রিক পাশ বউয়ের বিপরীতে এরা আই.এ পাশ বউ ঘরে তুলল। কিন্তু গায়ে হলুদের তত্ত্বে মেয়েকে তাদের দেওয়া কুললক্ষ্মী, পতিব্রতা আর আর্যনারী এই বই তিনটি দেখেই ললিতার বান্ধবীরা অনুমান করে নিয়েছিল বিয়ের পর তার পরিণতি কী হতে চলেছে। তাই তাদের বলতে শুনি— "হায় হায় তোকে নিয়ে ওরা কী করবে ললিতা? একটি পরম সুপবিত্র আর্যনারী তৈরি করবে বুঝি?" যা- ই হোক, মহাসমারোহে বিবাহানুষ্ঠান সমাপ্ত

হলে বিদায়ের পূর্বে মা ললিতাকে পরামর্শ দিয়ে দিলেন বাধ্য নম্র হয়ে চলার। কারণ পড়া মুখস্থ করে ফার্স্ট হওয়া সহজ, কিন্তু শ্বশুরঘর করা অত সহজ না। এখানে ভগবানই ভরসা!

বুদ্ধিমতী ললিতা সমস্ত রকম পরিবর্তমান ঘটনাস্রোতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। আর বাহ্য ব্যাপার নিয়ে কারো সঙ্গে বাদানুবাদ করে সংসারে অশান্তি টেনে আনার মতো মূঢ়তা তার ছিল না। তাই শ্বশুরবাড়িতে এসে দুপাঁচ দিনের মধ্যেই সে সেখানকার আদব-কায়দা রপ্ত করে সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। তবে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির মন ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে ছাড়ে না। তাই দু-একটা দিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে সে অত সহজে বদলে নিতে পারেনি। মেয়েদের আড্ডার আসরে বসে তার ননদ মাধুরীর নিজের মুখে নিজের আচার-ব্যবহার রীতিকরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সে ভেবে পায় না, যে নিজের অসুস্থ ছেলের খেয়াল রাখতে পারে না, সে এসব কথা ঢাক পিটিয়ে বলে কী করে। আবার সেই আসরে সকলে মিলে ললিতার সম্মুখেই তার ব্যবহারের কায়দাকানুনের বিচারও করে। এতে অত্যন্ত সংকুচিত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। তার মূল্যের যাচাই কী তবে এখন থেকে চিরদিন এই শ্রেণির নিরুদিদি, তারিণীপিসি, হরির মা, রতনের মায়ের বৈঠকেই নির্ধারিত হবে! অতঃপর সন্ধ্যারতির সময় শাশুড়ির আহ্বানে ঠাকুরদালানে গিয়ে সেখানে উপস্থিত মেয়েদের নানা আলাপ আলোচনার যে অংশবিশেষ সে শুনতে পেল তাতে সে শিহরিত হয়ে উঠল।

> এইসব আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ ধরিয়া যে কথাটা একান্ত স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সেটা এই যে, মূল্য নাই, মূল্য নাই। বাঙালি ঘরে বাঙালি মেয়ের এমন কোনোই মূল্য নাই, যাহার জোরে তাহার বাঁচিয়া থাকা বা না থাকা খুব একটা বড়ো ব্যাপার হইয়া ওঠে।[৩০]

ললিতা দেখে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোনো বাড়ির বউয়ের সম্পর্কে বা এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হওয়া মেয়েটির সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সেখানে উপস্থিত নারীদের মধ্যে সামান্যতমও সহানুভূতির মনোভাব পরিলক্ষিত হয় না। সকলের কাছে এসব ব্যাপার এতটাই সহজ-স্বাভাবিক।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ললিতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে, মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষ মাত্র, তার অতিরিক্ত আর কিছু নয়— সে কথাটা যেন সেখানকার বাতাসে আলোতে আকাশে মাখানো রয়েছে। প্রত্যেকটি ধূলিবিন্দু পর্যন্ত যেন তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করছে। তাইতো বিয়ের দুদিন যেতে না-যেতেই সে শুনতে পায় বউভাতের নিমন্ত্রণ নিয়ে বাড়ির কর্তা-গিন্নির মধ্যে বচসা বাঁধলে কর্তা চিৎকার দিয়ে গিন্নিকে বলেন— "তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতো থাক। তোমার এসব কথায় থাকবার দরকার কী? আর বোঝই বা তুমি কী? ...মেয়েমানুষ হয়েছ, দশ হাত কাপড়েও কোঁচা নেই, সব বিষয়ে বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না।" আবার কখনো শোনে তার যে ননদ শ্বশুরবাড়িতে হওয়া নিজ প্রশংসা সকলের কাছে জাহির করছিল সেই মাধুরীর স্বামী সামান্য কাপড়ের প্রসঙ্গ নিয়ে রুক্ষ গলায় তাকে ধমক দিয়ে বলছে—

> কে বলেছে সর্দারি করে তোমাকে কাপড় আনতে। জান আমি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাড়া কাপড় পরি নে, চুয়াল্লিশ ইঞ্চির ঠেঁটি কাপড় নিয়ে আমি করব কী? মেয়েমানুষ আছ, মেয়েমানুষের মতো থাকলেই তো পার, মোড়লি করতে আস কেন?[৩১]

এইসব দেখে শুনে সভয়ে চোখ বুঝে ললিতা। দেখতে পায় নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি। বুঝতে পারে কিছুদিনের মধ্যেই সে-ও অবশ্যই নিজেকে এক 'মূল্যহীনা' 'মেয়েমানুষ মাত্র' ভাবতে শুরু করবে। তাই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসে তার স্বামী যখন তাকে জিজ্ঞেস করে কেমন লাগছে এখানে তখন উত্তরে সে বলে—

> বেশ লাগছে। আমি যে আর কিছুই নই, মেয়েমানুষ মাত্র, সে তত্ত্বটি ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি।

আশা হয় উপলব্ধি আরও প্রগাঢ় হবে।[৩২]

কিন্তু তার এই কথাটির মধ্যে যে কতটা বিদ্রূপ ছড়ানো রয়েছে তা আর তার স্বামী উপলব্ধি করতে পারে না।

সাবিত্রী রায়ের (জন্ম-১৯১৮) 'অন্তঃসলিলা' গল্পের আরম্ভই হয়েছে মেয়েদের লেখালিখির প্রতি পুরুষ সাহিত্যিকদের অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে। দেবব্রত কফি হাউসের এক জমায়েতে রাধারানি পাবলিকেশনের নতুন কনট্র্যাক্ট 'শকুন্তলা দেবীর উপন্যাস'-এর কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত লেখকেরা ঠাট্টার সুরে বলে ওঠেন

মেয়েদের লেখা আবার উপন্যাস। নির্ঘাত লস দিতে হবে রাধারাণি পাব্লিশারকে। তা ছাড়া আনকোরাও নিশ্চয়ই, নাম তো শুনিনি কখনো।[৩৩]

এই শকুন্তলা দেবীর দুটি ছোটগল্পের বই বেরিয়েছে শুনে এই লেখকগোষ্ঠীর মন্তব্য— "ও আবার গল্প নাকি। টেকনিকের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাতে?" দেবব্রত শকুন্তলা দেবীর একজন উৎসাহী পাঠক। তাই সমালোচকদের এরূপ মন্তব্যে তিনি লজ্জিত ও ব্যথিত হন। কিন্তু শকুন্তলার প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সংশয় জাগে না। তাই পরের দিন তাঁর পত্রিকার পরের সংখ্যার জন্য একটা লেখা জোগাড় করতে তিনি শকুন্তলা সেনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু ঠিকানানুয়ায়ী এক সরু আবছা অন্ধকার নোংরা গলিতে প্রবেশ করেন এবং সেই গলিতেই যে শকুন্তলা দেবীর আস্তানা, সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, তাঁর মন বেশ খানিকটা দমে যায়। আর নম্বর মিলিয়ে একটা বহু পুরনো আমলের স্যাঁৎসেতে বাড়িতে প্রবেশ করে সেখানে একজনের নির্দেশানুযায়ী এক বারান্দা ঘুরে, ফ্রক পরা এক বালিকার খুলে দেওয়া দুয়ার দিয়ে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে একেবারেই দমে যান দেবব্রত।

আধা অন্ধকার ঘরখানার মাঝখান দিয়ে একটা প্রশস্ত পর্দা টানানো— পার্টিশনের কাজ করা উদ্দেশ্য। আরেকদিকে দুইখানা তক্তপোশ জোড়া দেওয়া। তার ওপর রাত্রির শয্যা গোছানো রয়েছে— রং ওঠা একটা পুরু সুজনি দিয়ে ঢাকা। স্তূপীকৃত বালিশের বিপুল উচ্চতা বড়ো বেশি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যেন এবাড়ির জনসংখ্যা। একপাশে একটি নবজাত শিশুর শয্যা— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিশ কাঁথা অয়েলক্লথ। দেওয়ালে টানানো অসংখ্য দেবদেবীর আর গুরুদেবের ছবি। উপরে জানালার তাকে তাকে বই, খাতাপত্র, পুরানো পত্রিকার পাঁজা।[৩৪]

সেখান উপস্থিত হয়ে দেবব্রত তাঁর পত্রিকার জন্য লেখাটাতো পেয়েই যান, সেইসঙ্গে এটাও জানতে পেরে যান যে এই লেখিকাকে কী লড়াইটাই না করতে হচ্ছে এই সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। একদিকে রয়েছে দারিদ্র, একান্নবর্তী সংসারের কাজের বোঝা, সন্তানদের প্রতি কর্তব্য ; আর এসবের ওপর এই লেখালিখির কাজ করার জন্য পরিবারের সদস্যদের নানারকম বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। দেবব্রতবাবু সেখানে বসেই শুনতে পান পর্দার আড়াল থেকে কোন এক মহিলার কাছে শকুন্তলা দেবীর শাশুড়ির মন্তব্য—

ছেলেপুলের মায়ের কি আর দিনরাত কলম নিয়ে বসে থাকলে চলে!... বিদ্বান ছেলের বিদূষী বউ। যত জ্বালা হয়েছে আমার।[৩৫]

বা আবার কখনো বিধবা শাশুড়িকে রান্না করে দেওয়ার প্রসঙ্গে— "আমি তো বলি বউকে, তোমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়, আমার আতপচালটুকু আমিই ফুটিয়ে দিই। আমরা মূর্খ মানুষ, আমাদের তো আর সময়ের মূল্য নেই তাদের মতো।"— এখানে ছেলের বউয়ের কাজের প্রতি যে শাশুড়ির কতটা সহায়তার মানসিকতা আর কতটা যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিশ্চয়ই কাউকে আর স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে

না। তাঁর কথার বিদ্বেষ-চুয়ানো প্রতিটি উচ্চারণেই ধরা পড়ে অনুচ্চারিত বহু অনুযোগ। শুধু যে শাশুড়ি, তাই নয়। রহস্য-রসিকতার সম্পর্কের দরুন কথা শোনানোর সুযোগ ছাড়ে না দেওরও। দেবব্রতের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে বিষ-ঝরা রসিকতা করে বলে—

> কী বউদি, গল্প লিখতে গিয়ে নিজেই আবার গল্পের নায়িকা হয়ে পোড়ো না যেন।[৩৬]

শকুন্তলা দেবীর স্বামীরও কোনো উৎসাহ দেখা যায় না স্ত্রীর সাহিত্য চর্চার প্রতি। বরং শকুন্তলাদেবীর গল্পটি রবীন্দ্র সংখ্যায় ছাপানো হবে, একথা দেবব্রত তাঁকে জানাতে গেলে তিনি মাঝপথেই তাঁর কথা থামিয়ে দিয়ে উত্তরে "এককালে ছিল ওসব সাহিত্য-টাহিত্যের উৎসাহ। এখন কলেজ আর টিউশন"— এটা বলেই স্নানের জন্য চলে যান। এরই মধ্যে শকুন্তলা দেবীর এক ভাই পূর্বের কথানুযায়ী শকুন্তলা দেবীর কাছে দলীয় কোনো এক কর্মীর চিকিৎসার জন্য দশ টাকা চাঁদা চাইতে এলে শকুন্তলা সেই সামান্য টাকাটাও ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারেন না, এমনই অভাবের সংসার তাঁর। দেবব্রত সেখানে বসে বসেই গল্পটা একবার পড়ে নিচ্ছিলেন। গল্পের বলিষ্ঠ ইঙ্গিতময় রেশটুকু যেন বারে বারেই হোঁচট খাচ্ছিল লেখিকার বাস্তবের এই অবস্থার সঙ্গে। দুই গাছা শাঁখের চুড়ি, পরিধানে মিলের মোটা শাড়ি, আভরণহীন কানের দুই পাশে চূর্ণ কুন্তল, দুই হাতে হলুদের ছাপ মাখানো। শকুন্তলার বিবর্ণ, মৌন মুখের দিকে তাকান দেবব্রত। ভাষাহীন বেদনার নীরব আর্তনাদে বুঝি ছিঁড়ে পড়ছে কোমল আত্মা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একজন অদেখা কর্মীর প্রাণের মমতায়, আর স্নেহের ভাইয়ের আশাভঙ্গের ব্যথায় বিদীর্ণ দৃষ্টি। তবু দশটি টাকাও দেওয়ার শক্তি নেই তাঁর। আর এইসব কিছু দেখে-শুনে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আসতে আসতে দেবব্রত তন্ময় হয়ে ভাবেন,

> এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ![৩৭]

এক স্বাভিমানী রমণীর অস্তিত্বের লড়াইয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে জাহানারা ইমামের রচিত ছোটগল্প 'আসাদের মা'-তে। মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তা সারানোর জন্য রাহেলা এক গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে গেলে সেখানেই হঠাৎ করে তাঁর দেখা হয়ে যায় আসাদের খালাতো (মাসতুতো) ভাই আশেকের সঙ্গে। অবশ্য প্রথমে তিনি তাকে চিনতে পারেন না। আশেকই এগিয়ে এসে নিজ পরিচয় দেয়। আর এরপরই রাহেলার মাথায় ভিড় করে আসে পুরনো দিনের সব কথা। মানে, আসাদের মা, শেফু আপার সঙ্গে জড়িত সব ইতিহাস।

স্বামী কাসেমের সঙ্গে বহু বছর পূর্বে তাঁর ব্যবসায়ের এক পার্টনার জোনাব আলির পুরনো ঢাকার বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেখানেই রাহেলার পরিচয় হয় জোনাব আলির স্ত্রী শেফু আপার সঙ্গে। "টকটকে ফরসা রং, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল, পানের রসে রাঙা ঠোঁট, মুখে সবসময় মৃদু একটা হাসি। সেদিন তিনি চওড়া লালপাড়ের সাদা একটা শাড়ি একপ্যাঁচ দিয়ে পরেছিলেন, লালপাড়টি খোলা একঢাল চুলের ওপর দিয়ে মুখটি ঘিরে ছিল, চাবিবাঁধা আঁচল গলার পেছনে বেড় দিয়ে ডান কাঁধে ঝুলছিল। খাওয়াদাওয়ার পর তিনি পানের বাটা নিয়ে খাটে বসে পান বানাচ্ছিলেন, ফরসা সুগোল হাত ভরতি সোনার চুড়ি ও কঙ্কণ ঠুনঠুন বাজছিল, গলায় চওড়া বিছে হার আর কানের পাথর বসানো দুল চমকাচ্ছিল।" এরপর আরও বহুবার দুজনের দেখা হয়েছিল। দুই পরিবারের পাশাপাশি রাহেলা ও শেফুর মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শেফুদের নতুন বিশাল বাড়িতেও দাওয়াত খেয়ে এসেছিলেন রাহেলারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাহেলা বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি মৃদুভাষিণী আর মৃদুহাসিনী শেফু কত জেদি আর একরোখা। বুঝেছিলেন অনেক বছর পর। এরপর কাসেম ও জোনাব আলির ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভেঙে গেলে দুই পরিবারের মধ্যে যেমন সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে তেমনি সাংসারিক কাজকর্মের চাপে পড়ে রাহেলা ও শেফুর দেখা-সাক্ষাৎও প্রায় একরকমের বন্ধ হয়ে যায়। এরপর

হঠাৎই একদিন রাহেলা তাঁর স্বামীর মুখে খবর পান শেফুর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের। কিন্তু এর ফলে শেফুর কী হয়েছে তা আর জানা যায় না। আর নানা ঝুট-ঝামেলায় দিন কাটাতে কাটাতে রাহেলাও একপ্রকার ভুলেই যান তাঁর শেফু আপাকে। বহুবছর পর তাঁর ছেলে নাসিম তাঁকে নিয়ে যায় শেফুদের বাড়ি। নাসিম ও আসাদের বন্ধুত্বের সূত্রেই আবার এই যোগাযাগ। কিন্তু এই শেফু আর আগের শেফু নেই, দেখে চেনাই যায় না। অনেকটা রোগা, সেই রঙের জৌলুসও কোথায় চলে গেছে, গায়ে একটিও গহনা নেই, পরনে সরু পাড় কম-দামি সাদা শাড়ি। কেবল অপরিবর্তিত রয়েছে মুখের সেই মৃদু হাসি। এই শেফুর মুখেই রাহেলা তখন জানতে পারেন স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করে তিনি কীভাবে একমাত্র সন্তানের হাত ধরে স্বামীর সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন এবং তারপর কীভাবে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে, গয়নাগাটি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করেছেন।

কিন্তু এর কিছুকাল পরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন রাহেলা তাঁর স্বামী ও পুত্রকে হারান, তেমনি অপরদিকে শেফুও হারান নিজ পুত্রকে। এরপর আবার দীর্ঘদিন দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। বোনপোকে সঙ্গে নিয়ে 'শোতের শেওলার নাহান' শেফুকে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় অর্থাভাবের জন্য। মাঝে একবার আবার দুজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলে ছেলের মৃত্যুর পর শেফুর দুর্দশার কথা জানতে পেরে রাহেলা তাঁকে সাহায্যের জন্য মাসে মাসে দুশো টাকা করে দিতে শুরু করেছিলেন। অনেক আপত্তি করে, অনেক লজ্জিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলেনও শেফু। কিন্তু মাস কয়েক পর একদিন যখন হঠাৎ তিনি নিজের থেকেই এসে বললেন তাঁকে দুমাসের টাকা আগাম দিতে পারলে খুব উপকার হয়, তখন তা শুনে রাহেলার ভ্রূ কুঁচকে মুখটা একটু কালো হয়ে যায়, যদিও সামান্য অসুবিধে হওয়া সত্ত্বেও টাকাটা তিনি দিয়ে দেন। ওদিকে শেফুও টাকাটা নীরবে নিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখে ফুটে ছিল অসহায় লজ্জা, অপমান আর যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু তারপর আর কোনোদিন আসেননি তিনি রাহেলার কাছে। শেফুর স্বামীর বাড়িটা ছিল শেফুর নামে। স্বামীর ওপর নিদারুণ অভিমানে, ক্রোধে ও ঘৃণায় সেই বাড়ি এককথায় ছেড়ে চলে এসেছেন তিনি। সেই শেফুকে যখন অর্থের জন্য অপরের কাছে হাত পাততে হয় ও ফলস্বরূপ অপরের এই বিরক্তি মাখানো মুখ তাকে দেখতে হয়, তা যে তার জন্য কতটা পীড়াদায়ক তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এদিকে রাহেলা নিজের ভুল বুঝতে পেরেও শেফুর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেননি। কারণ, তাঁর ঠিকানা তাঁর কাছে নেই। সরু গলির মধ্যে দিয়ে তাঁর যেতে কষ্ট হবে বলে তাঁকে শেফু কখনো নিজ ঠিকানা দেননি।

অবশেষে এক দীর্ঘ ব্যবধানের পর আশেকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় এবং শেফুর কথা জানতে পারায় তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তাঁর সেই শেফু আপার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এবার আর রাস্তার কষ্টকে তিনি প্রাধান্য দেন না। "কী আজব কথা। রাজরানি এককথায় রাজ্যপাট ছেড়ে পথের ধুলোয় নেমে বসত করছেন। তার বাসায় যেতে রাহেলার কষ্ট হবে!" আশেকের আপত্তি সত্ত্বেও পথের কষ্টকে উপেক্ষা করে তিনি পায়ে হেঁটে বর্ষার জলে কাদায়, ময়লায় একাকার হওয়া এক বস্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অনেক বড়াই করে হাঁটু অবধি খড়কুটো, জঞ্জাল, মানুষের মল পর্যন্ত ভাসতে থাকা জলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত শেফু আপার জলের তলে ডুবে যাওয়া ঘরে ঢুকতে পারলেন না এমনই দুরবস্থা সেখানটার। তাঁকে এগোতে বাধা দিয়ে এগিয়ে এলেন আসাদের মা শেফু আপা।

> আসাদের মা দুইহাতে কয়েকটা ছোটো পুঁটলি উঁচু করে ধরে ওই ঘরটা থেকে নেমে এঘরের দিকে আসছেন। ছোট্টখাট্ট মানুষ, পানি তার বুকসমান। ঘোলাটে পানিতে ভাসছে কত কী জঞ্জাল, খড়কুটো, মানুষের মল। সেইসমস্ত নোংরা দুর্গন্ধ জঞ্জালের ভেতর দিয়ে একবুক

পানি উজিয়ে আসাদের মা আসতে লাগল।[৩৮]

সেলিনা হোসেন রচিত এক অসাধারণ গল্প হচ্ছে 'মতিজানের মেয়েরা'। বলা যায় একটি মেয়ের জন্ম দুবার হয়। প্রথমত তার মায়ের কোলে, দ্বিতীয়ত বিয়ের পর স্বামীগৃহে। জন্মের পর থেকে একটি মেয়ে যেমন নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু শিখতে শিখতে বড় হয়, তেমনি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অন্য এক পরিবেশের মধ্যে তাকে অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আবার নতুন সাজে ঢেলে নতুন করে গড়ে উঠতে হয়।

> বিয়ে হলে নতুন সংসারে মেয়েদের একটা অবস্থা নির্ধারণ হয়, সে বাড়ির বউ হয়, বউ হওয়া মানে একটা নতুন জনম— সুখ-দুঃখ অনেক কিছু মিলিয়ে আপন ভুবন— সংসারের কর্তৃত্ব— এমন একটা ধারণা ছিল মতিজানের।[৩৯]

আসলে প্রত্যেক মেয়েরই তো থাকে অনেক স্বপন অনেক কল্পনা। নিজ হাতে সাজিয়ে তুলতে চায় সে তার সেই নতুন সংসারকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি বিয়ের পরও ছেলের মা বা সেই স্থানীয়কেও ছেলের সংসারের দায়িত্ব বধূর হাতে অর্পণ করতে চান না, ছেলের সংসারের রেশও টেনে ধরতে চান নিজে, অবশ্য ছেলেদেরও সমর্থন থাকে তাতে। আর তখন নববধূটির স্বপ্নভঙ্গ হয়ে সংসারটা তার কাছে বিষিয়ে ওঠে ও আরম্ভ হয় সাংসারিক অশান্তির। মতিজানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই তার স্বপ্নভঙ্গের করুণ পরিণতির চিত্র। বিয়ের পর সাতটা দিনও ওর ভালো কাটেনি। শাশুড়ি ঠিকমতো কথা বলে না, স্বামীকেও সে বুঝতে পারে না। স্বামীর ঘর করতে এসে এই সংসারে ওর অবস্থানটা যে কোথায়, ওই সংসারে ওর কী প্রয়োজন সে কিছুই বুঝতে পারে না।

> মাথার ওপর আছে শাশুড়ি, সংসার তার, সে-সংসারে মতিজান বাড়তি মানুষ। এই বাড়তি মানুষ হওয়ার কষ্ট ওর বুক জুড়ে। শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বুক পুড়িয়ে খাক করে দেয়। তখন মতিজানের হৃদয় থেকে সংসারের সাধ উবে যায়। ও বিধবা হতে চায়।[৪০]

মতিজানের শাশুড়ি গুলনুর ছেলে আবুলের জন্মের পরই বিধবা হয়ে কারো কোনো সাহায্য ছাড়াই শক্ত হাতে সংসারটাকে টিকিয়েছে, ছেলেকে বড় করেছে। সুতরাং সে তার নিজের হাতে গড়া সংসারটা অপর কাউকে ছেড়ে দেবেই-বা কেন। মতিজানের তো অনেক সময় এমনও মনে হয় যে গুলনুরের সংসারে তার ছেলে আবুলও বাড়তি মানুষ। তবে তার সমস্ত মন দখল করে আছে তার মা। স্ত্রীর প্রতি হয়তো গোপনে তার খানিকটা ভালোবাসা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু মায়ের ওপর কোনো কথা বলার মতো সাহস তার নেই। তাই সে সবসময় পালিয়ে বেড়ায় ও গাঁজা, মস্তানি ও মেয়েমানুষ নিয়ে ডুবে থাকে। গুলনুরও ছেলের এই বারাঙ্গনা-প্রীতি সম্পর্কে জেনেও তাকে কিছু বলে না। বরং ছেলে বাড়িতে না থাকলেই খুশি হয়— মতিজানকে বেশ নিংড়ানো যায় বলে গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে, সন্ধ্যায় ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে বলে ঘাস খেতে। আর এইসব দেখে-শুনে মতিজানও তার শাশুড়ির মতোই শক্ত হয়ে উঠতে চায়, শাশুড়ির গঞ্জনা ওকে ভেতরে ভেতরে জেদি করে তোলে। মতিজানের বাবা কথানুযায়ী বিয়েতে যৌতুক না-দেওয়ায়ও মতিজানকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তখন বাপের ওপরও তার রাগ হয়।

> ওর বিয়ে না হলে কী ক্ষতি হত? ও তো চেয়েছিল গ্রামে সমবায়ের কর্মী রেলি বুয়ার সঙ্গে নকশিকাঁথার কাজ করতে। নিজের রোজগার নিজে করবে বলে ওর জেদ হয়েছিল। বাদ সাধল বাবা। মেয়ের বিয়ে না হলে তার মানসম্মান থাকবে না। যে-কোনো উপায়ে বিয়ে দিতে হবে। কেন? কেন? ...হায় বিয়ে, কোথায় সংসার, কোথায় স্বামী? ওই কি বাবার

> সম্মান? গরিবের মানসম্মান তো ভাত-কাপড়।[৪১]

এসব কথা ভেবে ভেবে আগে ও খুব কাঁদত ও কষ্ট পেত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই সে 'একটা শক্ত মেয়েমানুষ' হওয়ার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। মাতাল, জুয়াড়ি, পরনারী আসক্ত স্বামীর প্রতি ও কোনো টান বা কোনো ক্ষোভ অনুভব করে না। এখন একজন প্রতিপক্ষকেই ও সামনে দেখে— গুলনুর, তার সঙ্গেই মতিজানের যুদ্ধ।

এরপর একেবারে পালটে যায় মতিজান। ভাইয়ের কাছে নিজের বর্তমান অবস্থার কথা বলতে গিয়ে শাশুড়ির চোখ রাঙানোকে উপেক্ষা করে পাগলের মতো হাসিতে ভরিয়ে দেয় ঘর। আর এরপর থেকেই মতিজানের বুকের ভেতর উপেক্ষা করার শক্তি প্রখর হয়ে ওঠে। সারাদিন কাজের পর শাশুড়ি তাকে ভাত না দিলে সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে "ক্যানহে?... হামিতো এই বাড়ির কামের মানুষ। কাম কর‍্যা ভাত খাই। বস্যা ভাত খাই না। হামাকে ভাত দেব্যা ল্যাগবি। মানুষে কামের মানুষকে ভাত দ্যায় না।" এই বলে সে নিজে রান্নাঘরে ঢুকে আবুলের জন্য রাখা ভাত তরকারি নিয়ে খেতে থাকে। আবুলের জন্য রাখা মাছের বড়ো টুকরো আজ ওর কপালে। একি ভাগ্য! নাকি অধিকার? নিজের অধিকার নিজে বুঝে নেওয়া! মতিজানের ঠোঁটে চিকন হাসি খেলে যায়। ওর বুকের ভেতর জয়ের মহানন্দ; ঘন কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে। বিয়ের পর এই প্রথম ওর খুব ভাল লাগে। গুনগুনিয়ে গান গায়। তবে শাশুড়িকে মোক্ষমভাবে পরাজিত করে তখন, যখন তার কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাকেই শাশুড়ি বাঁজা রূপে চিহ্নিত করে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দিয়ে বংশ রক্ষার কথা বলে, তখন সে শাশুড়ির অজান্তে স্বামীর বন্ধু লোকমান, যার সঙ্গে ইতিপূর্বে তার কথা বলারও সুযোগ ও সাহস ছিল না, সেই লোকমানের ঔরসে পর পর দুই কন্যার জন্ম দিয়ে বাড়ি ভর্তি লোকের সামনে চিৎকার করে জানিয়ে দেয় গুলনুরের ছেলের সন্তান জন্ম দেওয়ার অক্ষমতার কথা—

> সবাইকে সচকিত করে দিয়ে খি খি করে হেসে ওঠে মতিজান। বলে, বংশের বাত্তি? থুঃ, আপনার ছাওয়ালের আশায় থাকলে হামি এই মাইয়া দুইডাও পেত্যাম না।[৪২]

এক বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে ত্রিপুরার লেখিকা মীনাক্ষী সেনের (১৯৫৪) 'লিভ টুগেদার' গল্পটি। আমরা সকলেই জানি বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত কণ্ঠিবদল প্রথার কথা। আমাদের সমাজের স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সেখানে নেই। সেখানে

> কণ্ঠি পড়াইল তো সঙ্গের সঙ্গী হইল। কণ্ঠি খুললে কে বা কার। গেরস্থ লোক এর মর্ম বোঝে না।[৪৩]

তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ঘুচে গেলে তারা কণ্ঠি ছিন্ন করে চলে যায় ও অন্য যেখানে মনের মানুষকে পায় সেখানে গিয়ে আবার কণ্ঠি বদল করে নতুন করে ঘর বাঁধে। ভবানী বৈষ্ণবীর নাতনী দিয়ার মতে "আধুনিক লিভ টুগেদার...।" কিন্তু এরই মধ্যে এমনও তো অনেকেই আছে যারা এত সহজে এক প্রেম ভুলে আরেক প্রেমে পড়তে পারে না, এক আকর্ষণ ছিন্ন করে আর এক বন্ধন পাশে জড়াতে পারে না। এই না-পারা এক বৈষ্ণবীর জীবনকাহিনিই হচ্ছে এই গল্পটি। তিরিশ বছর আগে স্বামী পরিত্যক্তা কমলা বৈষ্ণবী পঁচিশ বছর ধরে ভোলা বৈষ্ণবের সঙ্গে কণ্ঠিবদল করে রানির খামারের আখড়ায় বসবাস করছিল। কিন্তু ইদানীং যে ভোলা বৈষ্ণবের মন কমলার থেকে সরে গিয়ে রেখারানির ওপর বসেছে তা বুঝতে পারে কমলা। মাঝ রাত পর্যন্ত সে যখন ভোলা বৈষ্ণবের অপেক্ষায় আখড়ার নিজ ঘরে বসে গোবিন্দ নাম জপ করে, তখন পাশের রেখারানির ঘর থেকে ভোলা বৈষ্ণবের গল্প হাসির আওয়াজ ভেসে এলেও সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। কারণ সে মনে করে সব সত্যির সামনে দাঁড়াতে নেই, কিছু কিছু সত্যি পর্দার আড়ালে

থাকাই ভালো। তবে কমলা বৈষ্ণবী তখন বসে নিজের ছোট আরশিখানা নিয়ে। "কমলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখখানা দেখে। চোখের কোনা থেকে গালকে আধা চাঁদের মতো ঘিরে ধরে দুটি নাকের দু-পাশ ঘেঁষে চিবুকের দিকে নেমে এসেছে দুটি ভাঁজ। এ ছাড়া মুখে আর কোথাও দাগ নেই। কপালটি নিভাঁজ পরিষ্কার। চুল পাতলা হলেও অর্ধেক কপাল ঢেকে ফেলে এখনও। রং এখনও চকচকে ফরসা, তবে রঙের জেল্লা চলে গিয়ে কেবল রংটিই পড়ে আছে। চোখের কালো মণিতেও এখন আগের মতো চমক নেই। কমলা জোরে শ্বাস টেনে হাতের আয়না নামিয়ে রেখে চোখ নিচু করে নিজের বুক দুটির দিকে তাকায়।..." সে বুঝতে পারে নিজ অক্ষমতার কথা। কিন্তু সেই সময়ও তার মন ভরে ওঠে লিলু বৈষ্ণবীর চিন্তায়। পুরুষকে বেঁধে রাখার সমস্ত কৌশল জানা সত্ত্বেও দশ বছর একত্র ঘর করার পর বৈষ্ণব কুঞ্জমোহন যাকে ফেলে আরেক মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে এবং সেই কুঞ্জমোহনের অপেক্ষাতেই দশ বছর ধরে বসে থেকে থেকে অবশেষে যে লিলু বৈষ্ণবীর মৃত্যু হয়েছে, সেই লিলুদিদির এবং আখড়ার বড় বৈষ্ণবকে ভালোবেসে যে অসাধারণ সুন্দরী মালতীবালা বৈষ্ণবী তার সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিল, কিন্তু বড় গোঁসাই যার দিকে কখনো ফিরেও চাইল না, আর বড়মার মৃত্যুর পর যখন বড় গোঁসাইয়ের শরীর ভেঙে গেল তখন থেকে সেই নব্বই বছরের বুড়োকে নাওয়ানো, খাওয়ানো থেকে আরম্ভ করে তার মল-মূত্র পরিষ্কার করা পর্যন্ত সমস্ত কিছু যে নীরবে প্রসন্ন মুখে করে চলেছে সেই মালতীবালার কথাই তার বড় বেশি করে মনে পড়তে লাগল।

রাতে ভোলা বৈষ্ণব ঘরে ফিরলে কমলা তার সঙ্গে যতই স্বাভাবিক ব্যবহার করুক না কেন, সে যখন কমলার বেড়ে দেওয়া গরম ভাত তরকারিও না-খেয়ে তাকে যা মুখে আসে তাই গালাগাল দিয়ে, সে যে বুড়ি হয়ে গেছে একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কমলার ঘুমন্ত ভোলাকে দেখে ভালো লাগে। "চুলে আজকাল কলপ মাখে ভোলা। তবু সামনের সাদা চুলগুলো লালচে বাদামি দেখাচ্ছে। কপালে অজস্র বলিরেখা, গাল বসে গেছে, মুখের ভেতর দাঁতও নেই কয়েকখানা। বয়স দেখায় ষাট-পঁয়ষট্টি। অথচ অত বুড়ো নয় ভোলা। গঞ্জিকা সেবন তার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে। কমলার কেমন মায়া হয় ঘুমন্ত, চেহারায় পৃথুল অথচ ক্ষয়াটে মুখের ভোলাকে দেখে। আবার দীর্ঘশ্বাস আসে।

> ভোলার বুড়ো-হয়ে-আসা চেহারা যদি তার মনে মায়া জাগায় তবে তার বুড়ো হওয়া ভোলাকে কেন বিমুখ করে? পঁচিশ বছর একসঙ্গে থাকলে তো ঘটি-বাটি-চৌকি-চারপাইয়ের ওপরও মায়া জন্মায় মানুষের— আর এ তো কণ্ঠিবদল করা জীবনসঙ্গী।[৪৪]

কমলা বুঝতে পারে, ভোলা যে অচিরেই আখড়ার বড় বৈষ্ণব হবে, তখন তার যে সম্পত্তি হবে সেই সম্পদের লোভেই আসলে যুবতী রেখারানি তার প্রতি আসক্ত হয়েছে। কিন্তু ভোলাকে তো আর এসব বোঝানো যাবে না। তাই সে চুপই থাকে। আর ওদিকে অচিরেই ভোলা তাকে ছেড়ে রেখারানিকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধে। কিন্তু কোনো আপত্তিই জানায় না সে। কমলার হিতাকাঙ্ক্ষীরা চায় কমলা কোর্টে নালিশ করুক, মহিলা কমিশনে জানাক, যাতে তারা ভোলাকে বুঝিয়ে দেয় যে এই আসন্ন সুখের দিনে তাকে ভুলে রেখারানিকে নিয়ে সে থাকতে পারবে না। কিন্তু কমলা তাতে বাধা দিয়ে বলে

> নারে মা। কাওরে বুঝাইয়া ধমকাইয়া মানানের কাম নাই। পঁচিশ বচ্ছর একত্তরে রইলাম, তাইতে যদি মায়া না জন্মাইল— যুবতী পাইয়্যা সব মায়া ছাড়ল তো কোর্ট-কাছারি-কমিশন তারে কী বুঝাইব।[৪৫]

তাই সে শুধু জোড়হাত কপালে ঠেকায় আর বলে "গোবিন্দ, তুমি পতিত পাবন, শ্রীমধুসূদন, মাইনষের মনে মায়া দাও, সুবুদ্ধি দাও গোবিন্দ।" কমলা বৈষ্ণবী এ-ও জানে যে অচিরেই ভোলা বৈষ্ণব এখন তাকে

আশ্রম থেকে বের করে দেবে। কিন্তু তবুও দিয়া যখন তাকে পরামর্শ দেয়, আর একজন ভালোমানুষ দেখে আবার কণ্ঠিবদল করে নিয়ে তার সঙ্গে লিভ টুগেদার করতে, তখন হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে সেই প্রসঙ্গটিই উড়িয়ে দেয় কমলা। আর যখন সত্যি সত্যিই রেখারানি ভোলা বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলে তাকে মিথ্যা দায়ে অভিযুক্ত করে আখড়া ছেড়ে চলে যেতে বলে, তখন সে আর একটা শব্দও না বলে আখড়ার সকলের আপত্তি সত্ত্বেও নিজ ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে নামে।

> গোবিন্দ, আমার লগে থাইকা যার সুখ নাই তার লগে জোর জবরদস্তি থাকোনের দুর্মতি যেন আমার না হয় কখুনো। কমলা ভেবেছিল, বলেছিল গোবিন্দকে।[৪৬]

পথ চলতে চলতে কমলা হাতের করতাল বাজিয়ে নামগান ধরে। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা যেন হু-হু করে করে ওঠে। যেন তার জীবনটাই পেছনে পড়ে অথচ সে সামনে এগিয়ে চলেছে। তার বুকে তো সর্বদাই গোবিন্দ থাকে, মুখে থাকে গোবিন্দ নাম। কিন্তু তবুও তার বুকটা এমন ফাঁকা মনে হয় যেন আর ভরবে না। নিজের অজান্তেই তার দুচোখ বেয়ে দরদর করে জলের ধারা নেমে আসে। আর এত প্রিয় গোবিন্দকে ভুলে এক মনে আনমনা হয়ে গেয়ে চলে— 'রাধে, রাধে, রাধে, শ্রীরাধে—'

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের 'বুমেরাং' গল্পটিও রচিত হয়েছে এক লেখিকাকে নিয়ে। সাবিত্রী রায়ের 'অন্তঃসলিলা' গল্পে আমরা দেখেছিলাম এক গৃহবধূকে সাহিত্য চর্চা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। তবে সেটি ছিল এক দরিদ্র পরিবারের কাহিনি। কিন্তু 'বুমেরাং' এক স্বচ্ছল, অভিজাত পরিবারের কাহিনি। তথাপিও এই গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দেখি অফিস থেকে ফিরেই একটা কথা বলায় ও তা শুনতে না পাওয়ায় সায়ন্তন, খাবার টেবিলের এক কোনায় বসে মুখ গুঁজে লিখে যাওয়া তার স্ত্রী দেবারতিকে উদ্দেশ করে বলে,

> এইজন্যই আগেকার দিনে বলত বটে, কানে কলম গুঁজে, গায়ে শামলা এঁটে মেয়েছেলেরা মোক্তারি করতে গেলে, সংসারের—... না, না, যাচ্ছ না বটে, কিন্তু হাতাখুন্তি ছেড়ে সাহিত্যিক হতে বসেছ কি না, সেটাই বলছি আর কি!... দেখছ না, কী হাল হয়েছে আমার! হাত পুড়িয়ে চা বানিয়েও খেতে হবে দু-দিন পরে।[৪৭]

তবে এক্ষেত্রে এরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কারণ আলাদা। সাংসারিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটার জন্য নয় ; বরং সাহিত্যচর্চার জন্য গৃহবধূ দেবারতিকে এইসব কথা শুনতে হয়েছে, কারণ অভিজ্ঞতার পরিসর সীমিত হওয়ার জন্য সে পরিচিতদের কাউকে কাউকে তার গল্পের চরিত্র করে তুলছে বলে। কিন্তু দেবারতিই-বা কী করতে পারে আর! গল্প খোঁজার জন্য মাছরাঙাটি হয়ে এর তার জীবনের পুকরপাড়ে বসে থাকা ছাড়া! কখন কোন জলে জটিলতা ঘাই মারবে আর ও কলমে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে শিল্প বানাবে! নিজেকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, দেবারতির জীবনটা প্রায় প্লেন ধোসার মতো, যার এদিক থেকে ওদিক দেখা যায়। ফলে পরের ধনে পোদ্দারি ছাড়া বেচারি করবেটাই-বা কী। শুধু তো আর স্বামী নন। কথা শোনাতে বাদ দেয় না মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও। তবে এসব অপমানকর ল্যাংগোয়েজ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায় না দেবারতি। সত্যি সত্যি তো ফোসকা পড়ে না গায়ে!

দেবারতির অবসাদগ্রস্ত একঘেয়ে জীবন দেখে তার এক বান্ধবীই তাকে প্রথম লেখালিখি করার পরামর্শ দেয়। সেই থেকে শুরু। প্রথম যখন কাগজে তার লেখা প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়, তখন সেসব প্রশংসা তো একলা কুড়োয়নি দেবারতি। বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে নিয়েছে। আমোদ-আহ্লাদ করেছে। কিন্তু সেই সুরটাই বেসুর বাজতে লাগল ইদানীং। আর মেয়েতো সরাসরি বলেই দেয় "ইম্যাজিনেশন পাওয়ার একটু কাজে লাগাও মা!

সত্যিকারের কিছু ছাড়া গল্প বানাতে পার না তুমি?" কিন্তু তাতেই বা মুক্তি কোথায়! এক সামাজিক ব্যাপার, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেন্ডার ইস্যুও— টিভিতে দেখা এমনই এক ঘটনা নিয়ে দেবারতির নতুন লেখাটি সাহিত্যিক মহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। বিয়ের আগেই পেটে বাচ্চা আসায় একটি মেয়ে লুকিয়ে অ্যাবরশন করতে গিয়ে মারা গেছে, এমন একটা নারীবাদের কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া মানবতাবাদী বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে গল্পটি। কিন্তু রাতে এক নিবিড় প্রেমের মুহূর্তে হঠাৎ সায়ন্তন ফিসফিস কিন্তু স্পষ্ট শব্দে বলল,

> অ্যাবরেশনটা করালে কবে? আমাকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিলে না, অ্যাঁ? একদম একা একা চলে গেলে, একটা ব্রা, পেটিকোট কিনতে হলেও তো আমার সঙ্গ ধর।... বাচ্চাটা আমার না অন্য কারোর? আহা, বলই-না! দেবারতি তাকিয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছিল একটা কনকনে বরফের ট্রে-র ওপর শুয়ে রয়েছে ও। সারা শরীর মরে উঠছে একটু একটু করে।[৪৮]

আমরা আমাদের এই আলোচনায় বাংলা ছোটগল্পের বিভিন্ন সময়ের দশজন মহিলা গল্পকারের দশটি গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন মনীষী নারীর অধিকার রক্ষার জন্য নানা সংগ্রাম করে গেছেন ও যার ফলশ্রুতিতে আজ নারীর সামাজিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন আইন প্রস্তুত হয়েছে। নারীর মানবিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের স্বাধীনতা ও উন্নতিকল্পে এত আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এর প্রার্থিত ফল পুরোপুরি আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। সময় ও সমাজ পালটেছে। বিশ শতকের নারীবাদী ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছে আজকের নারী। পৃথিবীতে পুরুষ থাকবে শোষকের ভূমিকায় আর নারী থাকবে শোষিতের ভূমিকায়— পুরুষ-সমাজের তৈরি এই পরম্পরাটাকে নিয়ে নারীবাদীরা আজ প্রশ্ন তুলেছেন। আজকের নারী চায় প্রকৃত মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি এবং দয়া, করুণা ও অধঃস্তনের অবস্থা থেকে মুক্তি। যদিও সহজ নয় তার এই মুক্তির পথ। পারিপার্শ্বিক সমাজ যে নারীর এই মুক্তিপথে কীভাবে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের আলোচ্য গল্পগুলিতে তার বহু উদাহরণ আমাদের গল্পকারেরা তুলে ধরেছেন। আসলে নারীদের চাওয়া ও বাস্তবে তা কার্যকরী করার মধ্যে এখনও অনেক ফারাক রয়েছে। আজও মেয়েরা নিজ জীবন ও জগৎকে কীরূপে দেখবে তা নির্ধারণ করে দিতে চায় পুরুষ। আর তার বিরোধিতা করতে চাইলেই মেয়েদের নামে রটে যায় নানা কুৎসা। আঙুল ওঠে তার চরিত্রের ওপর। বাক্রুদ্ধ হয়ে যেতে হয় দেবারতিদের মতো শিল্পীদের। কিন্তু এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীর এই অস্তিত্বের লড়াই থেমে যায়নি। সমস্ত অপমান, অত্যাচার, প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে মেয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের মুখে বলি হওয়া লজ্জাবতী, বিন্দু, নিভার মতো নারীরা আজও যেমন আমাদের সমাজে রয়েছে, তেমনি আছে শেফু আপা ও মতিজানের মতো মেয়েরাও, যারা সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজ নারীত্বকে সপ্রমাণ করে গেছে। মেয়েমানুষও যে মানুষ, ইচ্ছে করলেই যে তাকে অপমান করে দমিয়ে রাখা যায় না, স্বাধীনভাবে-সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার যে তারও রয়েছে কমলা বৈষ্ণবী, শেফু আপা, মতিজান যেন তারই পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র

১. 'ভূমিকা', সুতপা ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাঃ, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য অকাদেমি, ২য় প্রকাশ, ২০০৩

২. বালিকাশিক্ষার আদর্শ— অতীত ও বর্তমান, কামিনী রায়, সম্পাঃ সুতপা ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-১৯৭, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য'

৩. তদেব

৪. ভূমিকা, নারী, হুমায়ুন আজাদ, পৃষ্ঠা-১৫ আগামী প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ, ২০১২
৫. তদেব, পৃ-২৭২
৬. সই গল্প সংকলন, সম্পাঃ- নবনীতা দেব সেন, পৃষ্ঠা-১১, লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১৩
৭. সই গল্প সংকলন, সম্পাঃ- নবনীতা দেব সেন, পৃষ্ঠা-১৫
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪২
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯
১৫. তসলিমা নাসরিন, ‘অল্পস্বল্প গল্প’ : ভূমিকা, ‘আনন্দসঙ্গী: রবিবারের গল্প’, আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৬-১৭
১৬. সই গল্প সংকলন, সম্পাঃ নবনীতা দেব সেন, পৃষ্ঠা-৩৯
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫
২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫
২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫
২২. সুতপা ভট্টাচার্য, ‘বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য’, পৃষ্ঠা-৪২
২৩. সই গল্প সংকলন, সম্পাঃ- নবনীতা দেব সেন, পৃষ্ঠা-৫৬
২৪. তসলিমা নাসরিন, ‘অল্পস্বল্প গল্প’ : ভূমিকা, আনন্দসঙ্গী, রবিবারের গল্প, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬
২৫. সই গল্প সংকলন, সম্পাঃ নবনীতা দেব সেন, পৃষ্ঠা-৫৭
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২
৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯
৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৯০
৩২. তদেব, পৃষ্ঠা-৯১
৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১০১
৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৩
৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৪
৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫
৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬
৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৭
৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৮
৪০. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯
৪১. তদেব, পৃষ্ঠা-১১০
৪২. তদেব, পৃষ্ঠা-২০২
৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩২
৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩২

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৪
৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা--২৩৯
৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৮
৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০২

বীরচন্দ্র দেববর্মা : ইতিহাসে উপেক্ষিত এক কবি

প্রসূন বর্মন

বাংলা কবিতা বা গানের ইতিহাসে বীরচন্দ্র দেববর্মা বা বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৩৯-৯৬) অপরিচিত নাম। তাঁর কাব্য-কবিতা ও গান মূল স্রোতের বাংলা সাহিত্যে কখনওই আলোচিত হয়নি। কেন হয়নি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে।

গান, কবিতা ও ফোটোগ্রাফিচর্চায় একজন দেশীয় রাজা নিজেকে বিলীন করেছেন, উনিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে তাঁর পরপর ছ'খানা কবিতা ও গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব রসে সিক্ত বীরচন্দ্র যথার্থই ছিলেন প্রচারবিমুখ। তাই তাঁর গান-কবিতা ঘনিষ্ঠজনের বৃত্তেই প্রচারিত ছিল— সে গণ্ডি থেকে তিনি বেরোতে চাননি। বাংলা কবিতার কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে, ত্রিপুরার রাজ-আঙিনায় তিনি কাব্য-সংগীতচর্চায় সক্রিয় ছিলেন।

বৈষ্ণব তত্ত্বে বীরচন্দ্র যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন, যেন তারই বাণী তিনি নবরূপে শুনিয়ে গেছেন। আর তার বিস্তার ও প্রভাব এতটাই ছিল যে ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর কুকি রাজাও কবিতাচর্চায় মজেছিলেন। যে কুকি সৈনিকেরা বিদ্রোহী জমাতিয়াদের নরমুণ্ড নিয়ে আগরতলার পথে উৎসব করেছিলেন, ত্রিপুরার পূর্বপ্রান্তে যে কুকিরা নিরন্তর সমস্যার সৃষ্টি করতেন— সেই কুকি সম্প্রদায়ের রাজা বাণ খাম্পুইয়ের মধ্যেও বীরচন্দ্র কাব্য-সংগীতচর্চার অঙ্কুরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তথাকথিত 'বর্বর', 'নৃশংস' জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বৈষ্ণব কাব্য-সংগীতচর্চার যে গ্রহণ ও প্রকাশ, সে কৃতিত্ব বীরচন্দ্রের, তাঁর কাব্য-কবিতার। কিন্তু তবুও নবচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বাঙালির হৃদয়ে তাঁর ঠাঁই হল না। ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন।

কবির জীবনচরিত : প্রাসঙ্গিক সূত্র

বীরচন্দ্রের আয়ুষ্কাল সাতান্ন বছরের। তাঁর এই জীবন আপাতভাবে তিন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে,

ক. প্রথম পর্ব: জন্ম, শিক্ষা ও প্রস্তুতি

খ. দ্বিতীয় পর্ব: রাজসিংহাসন লাভ ও প্রশাসক বীরচন্দ্র

গ. তৃতীয় পর্ব: প্রেমিক-কবি, সংগীতজ্ঞ ও সংস্কৃতিমনস্ক ভাবুক

বর্মন, প্রসূন : *বীরচন্দ্র দেববর্মা : উপেক্ষিত রাজার কবিতা*
অরুণ, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, ২০১৬, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ১০৫-১১৯

বীরচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মা সুদক্ষিণা আর পিতা ত্রিপুর-রাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮২৯-৪৯)। বীরচন্দ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেছেন, সে বছরই কলকাতা থেকে প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১]

সেকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পাঠানো হত। কাশী বা বারাণসী নয়, উনিশ শতকে কলকাতাই পূর্ব ভারতের উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অসম থেকেও এ সময় অসমিয়া ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আগমন ঘটেছিল।[২] কিন্তু রাজন্য ত্রিপুরায় তখনও এ রেওয়াজ চালু হয়নি। তবে বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পূর্ব থেকেই। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির সখ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬১-১৯৪১) উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু তবু বীরচন্দ্র বা অন্যান্য রাজকুমারদের অন্দরমহলেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছেন রাজ-অন্দরে, গৃহশিক্ষকের কাছে। পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রই প্রথম রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।তাঁর যুক্তি ছিল, ইংরেজি ভাষাশিক্ষার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সে শিক্ষাই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের পথকে সজীব করে তুলবে।[৪]

বীরচন্দ্র ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। তবে আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটেছিল আরও পরে, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ। জীবনের নানা চরাই-উৎরাই পেরিয়ে চন্দ্রবংশের রাজসিংহাসন সুরক্ষিত করেছিলেন বীরচন্দ্র। কিন্তু অভিষেকের দিনই ঘোষিত হয় ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত। চট্টগ্রামের কমিশনার এইচ ইউলিক ব্রাউনিঙের এ প্রস্তাবে বীরচন্দ্র সহমত পোষণ করেননি। তিনি সে বছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের কাছে তিনটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা।

কিন্তু তবু পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হল। প্রথমাবস্থায় এই এজেন্টের কাজ ছিল মূলত দুরকমের। এক, পূর্ব সীমান্তে কুকি, লুসাই (মিজো) ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় করা এবং দুই, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-সম্পর্কিত দায়িত্ব।

বলা বাহুল্য, এ সময় থেকেই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হল। পূর্ববর্তী রাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী, অনেকটা Oriental রীতিতে। কিন্তু বীরচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর রাজতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকারের পলিটিক্যাল এজেন্ট।

কখনও ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সমঝোতা, আবার কখনও-বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ-দমন— তাঁর প্রায় নিত্যদিনের কর্ম ছিল। এরই পাশাপাশি ত্রিপুরায় সংস্কার-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল পৌরসভা। ১৮৭৩ সালের মে মাসে আগরতলায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনা হয়। পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট-অনুযায়ী ১৮৭২-৭৩ সালে রাজ্যে ছিল মাত্র দুটি বিদ্যালয়। এর পরিবর্তে ১৮৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সে সংখ্যাটি দাঁড়ায় পঁচিশে।[৫] আর মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল সাতশো। বলা বাহুল্য, ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিকতার সূচনা তাঁর আমলেই হয়েছিল।

পরবর্তীসময়ে রাষ্ট্রনৈতিক কাজকর্মের তুলনায় বীরচন্দ্র সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় ক্রমশ নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন। সাহিত্য ও সুকুমার কলার প্রতি অনুরাগের ফলে অনেকেই তাঁর রাজসভা আলোকিত করেছিলেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতজ্ঞ যদুভট্ট, তানসেনের বংশধর বীণ-বাদ্যকর লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা কাসেম আলি খাঁ,

নৃত্যশিল্পী নাট্যাচার্য কাশ্মীরের কুলন্দর বক্স, এসরাজ-শিল্পী গোয়ালিয়রের হায়দর খাঁ, পাখোয়াজ-বাদক কলকাতার পঞ্চানন্দ মিত্র, রাজকবি মদনমোহন মিত্র, দার্শনিক রাধারমণ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন তাঁর সভাসদ। আর এঁদের মধ্যমণি ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য। 'পলাশীর যুদ্ধ'-খ্যাত নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) সে কারণেই হয়তো বলেছেন,

> ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না।[৬]

সংগীত-নৃত্যের পাশাপাশি রাজদরবারে সাহিত্যালোচনাও চলত— প্রাচীন থেকে আধুনিক, সবরকমের সাহিত্য নিয়েই তাঁর উৎসাহ ও ঔৎসুক্য ছিল যথেষ্ট। শচীন দেববর্মার (১৯০৬-৭৫) পিতা রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার (১৮৫৩-১৯৩৯) ভাষায়,

> কবি মধুসূদনের তখন যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল সবগুলি আনাইয়া ছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে তিনি এমন অনুরক্ত ছিলেন যে কাহারও পাঠে ভাব পরিব্যক্তির বাধ পড়িলে বিচলিত হইয়া উঠিতেন।[৭]

— এই পরিবেশেই বীরচন্দ্র সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। হয়তো ভুলে থাকতে চেয়েছেন রণ-রক্ত-মাখা ইতিহাস। হয়তো ব্যক্ত করতে চেয়েছেন প্রেমিক হৃদয়ের আনন্দ ও বিষাদ-মাখা উল্লাস।

বীরচন্দ্রের কবিতা : প্রেম-শোক ও উল্লাস-গাথা

গ্রন্থ প্রকাশনায় বীরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার নানা দৃষ্টান্ত সেকালে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদে পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের মাধ্যমে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে তিনি ভক্তদের মধ্যে গ্রন্থটির শোভন সংস্করণ বিতরণ করেছিলেন। পাশাপাশি দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'ও তাঁর উৎসাহ ও হাত ধরেই প্রকাশিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দীনেশচন্দ্র গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন বীরচন্দ্র মাণিক্যকে।

রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শুধু পৃষ্ঠপোষকতাই করেননি, তিনি নিজেও কাব্য ও সংগীতচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল,

ক. সোহাগ (১৮৮৩)
খ. প্রেম মরীচিকা (১৮৮৫)
গ. অকাল কুসুম (১৮৮৬)
ঘ. উচ্ছ্বাস (?)
ঙ. হোরি (১৮৯১-৯২)
চ. শ্রীশ্রী ঝুলন (১৮৯২)
ছ. ফাল্গুনী (১৯১৬, বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রয়াণের পর প্রকাশিত)

বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথম কাব্যসংকলন 'সোহাগ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য আগরতলার 'বীরচন্দ্র' মুদ্রাযন্ত্রে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। এ কাব্যের মূল বিষয় প্রেম— পত্নীপ্রেম। কবি তাঁর তৃতীয় পত্নী মনোমোহিনী দেবীকে সংকলনটি উৎসর্গ করেছিলেন।

মনোমোহিনী দেবী ছিলেন মণিপুর রাজপরিবারের কীর্তিধ্বজ সিংহের কন্যা। কীর্তিধ্বজ মণিপুরের পরিবর্তে আগরতলাতেই বসবাস করতেন। উল্লেখ্য, মনোমোহিনী ছিলেন বীরচন্দ্রের প্রথম স্ত্রী ভানুমতী দেবীর (?-

১২৮৯) বোনঝি। মনোমোহিনীর সঙ্গে বীরচন্দ্রের বয়সের ফারাক প্রায় আঠাশ বছরের। চোদ্দো বছরের কিশোরী ভার্যার উদ্দেশে তিনি লিখেছেন,

ভাবের চন্দন আদরে মাখিয়া
কবিতা কুসুমে গাঁথিয়া হার,
প্রেম-উপহার দিলাম তোমায়
এ দীনের আছে কি ধন আর।

(উপহার)

বীরচন্দ্র প্রেমিক। তাই তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি,

রূপের সায়রের আঁখি ভুরিয়া রহিল।
যৌবন বনের মাঝে মন হারাইল।।

'সোহাগ' কাব্যে মোট বাইশটি কবিতা রয়েছে। সব কবিতাই প্রেম-বিষয়ক— প্রেমের নানা ভাব ব্যক্ত করেছেন কবি বীরচন্দ্র। বীরচন্দ্রের কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর যৌবন সঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে। আর সে প্রেম সতেজ ও সজীব— 'প্রেমরাজ্যে বসন্তের নাহি মাস ভেদ'। 'যৌবন বসন্ত' কবিতায় সে ইঙ্গিতই স্পষ্ট,

প্রকৃত হৃদয় যার
চির মধু বাঁধা তার,
প্রেমরাজ্যে বসন্তের নাহি মাস ভেদ।
শুভ্র কেশ হেরি অরসিক মনে খেদ
অন্তরে যৌবন যার সেই যুবজন,
চপলা চমক যেন বাহির যৌবন।

(যৌবন বসন্ত)

বীরচন্দ্র তখন চল্লিশোর্ধ্ব যুবা। তিনি রোমান্টিক, সৌন্দর্যান্বেষণে আকুল। তাই সেদিনের কথা, সে 'রূপরাশি'র কথা ভুলতে পারেননি—

কে যেন রেখেছে আনি
রূপের প্রতিমাখানি
সুমুখে আমার প্রিয়ে, ভরিয়া তখন—
নিরখি সে রূপরাশি ভুলিনু আপন।

(গত একদিন)

বীরচন্দ্র কিশোরী মনোমোহিনীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। তারপর বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি মনোমোহিনীর মন জয় করতে পেরেছিলেন প্রতাপশালী রাজা বীরচন্দ্র? নইলে কেনই-বা তিনি লিখবেন,

যার প্রেমে একবার ভুলিয়াছে মন,
তারে কি ভুলিতে পারে কোনদিন?
সেই মন তার লাগি
হয় চির অনুরাগী,

তারে ভালবাসে অনুদিন—
নাহি পেলে সেই জনে, বিরহ দহন,
অন্তরে বাহিরে তার পোড়ে অনুক্ষণ।
(ভাবোল্লাস)

এই দ্বন্দ্বে বীরচন্দ্র নিজে যেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তেমনই পাঠককেও ভাবিয়ে তুলেছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি যেন রূপ পেয়েছে সর্বজনীনতায়। আর এখানেই তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'সোহাগ' স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

'সোহাগ' কাব্য যে বছর প্রকাশিত হয়েছিল, সে বছরই মৃত্যু হয়েছে ভানুমতী দেবীর। মনোমোহিনীর সঙ্গে রাজার 'সোহাগ' যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ভানুমতী দেবীর সঙ্গে বীরচন্দ্রের দূরত্ব ততই বেড়েছে। এই বিরহ-শোকেই কি বীরচন্দ্রের প্রথমা পত্নী, প্রধান মহিষীর প্রয়াণ ঘটেছে? ভানুমতী দেবীর প্রয়াণে বীরচন্দ্র শোকে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিকাব্য 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১)। এ রচনার আবেদন শোকার্ত বীরচন্দ্রকে প্রশান্তি দিয়েছিল। 'ভালোবাসি— ভালোবাসি প্রেয়সী আমার', 'মুরলা রে— মুরলা কোথায়', 'তারি লাগি সহি ব'লে এতেক যাতনা' প্রভৃতি পঙ্ক্তিতে বীরচন্দ্র প্রধান মহিষী ভানুমতী দেবীকেই যেন বার বার খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ত্রিপুর-রাজ বীরচন্দ্র 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিশোর কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দূত মারফত পাঠিয়েছেন শিরোপা। সে কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) লিখেছেন, আবার অনত্র্যও বলেছেন—

> সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কর্‌লেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা কর্‌লাম। আপনারা হয়ত অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন— তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন, কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।...
>
> জীবনে যে যশ পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তা'র প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা।[৮]

শোকে বিহ্বল বীরচন্দ্র এবার ভাষা ও বাণী পেলেন। লিখলেন বেশ কিছু খণ্ড কবিতা। তাঁর এই শোকাকুল আর্তি সংকলিত হয়েছে 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যে। কাব্যটির প্রকাশকাল উল্লিখিত না-হলেও অনুমান করা যায় যে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রেম মরীচিকা'র কবিতাগুলি এলিজি শ্রেণির রচনা। এলিজি অর্থাৎ শোককবিতা-সম্পর্কে বলা হয় যে প্রিয়জন বা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কবির ব্যক্তিগত শোক-ভাবনা যে কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

আলেকজান্ডার পুস্কিনের (১৭৬৭-১৮৪৮) 'An Elegy', ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯-১৮৯২) 'O Captain! My Captain', ওডেনের (১৯০৭-৭৩) 'In Memory of W B Yeats' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

শোককবিতা। অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬৬-১৯১৯) 'এষা' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এলিজি। ভানুমতী দেবীর মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল বীরচন্দ্র একুশটি খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন। শুরুতেই 'উপহার' শীর্ষক কবিতায় বীরচন্দ্রের স্বীকারোক্তি স্পষ্ট,

তোমায় সঁপিতে এই কবিতা কুসুম হার,
আমার এই হাত কেন কাঁপে বার বার?
কাঁদিয়া গাঁথিনু এই হার,
হৃদে স্থান দিতে একবার, অশ্রুমাখা এই উপহার।
এই রূপে বর্ষ যাবে সুখ গেছে হর্ষ যাবে
গিয়াছে হৃদয়, যাবে হতাশ জীবন।

(উপহার)

ভানুমতীর মৃত্যুতে এ কোন বীরচন্দ্র? রাজাধিরাজ বীরচন্দ্র নন, এ যেন সাধারণ মানুষের হাহাকার। 'আমার এই হাত কেন কাঁপে বার বার'—তবে কি বীরচন্দ্রের মনে কোথাও অনুশোচনা এসেছে? ভিন্ন একটি কবিতায় তাঁর ভালোবাসা প্রসঙ্গে তিনি 'রূপ মোহ'-এর কথা বলেছেন। তিনি বলছেন,

আমার এ ভালোবাসা রূপ মোহ এ কি,
ভুলিনু শুধু কি তার রূপ নিরখিয়া?
চিনিনু চিনিনু এবে প্রেম মরীচিকা,
এই শোক তাপ দহন ভাগ্যের লিখা।

(ছায়া)

কবি ভালোবাসার কাঙাল। ভানুমতীর মৃত্যুতে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে মৃত্যুই মানুষকে নবজীবন দিতে পারে। পার্থিব জগতের লোভ-লালসা-সুখ-দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র মৃত্যু। তাই তিনি 'মরণের সুখ' পেতে চান,

চিরস্থায়ী প্রেম বুঝি ইহলোক নাই,
জীবন যে ক্ষণস্থায়ী তা ভুলে যাই।
সে সুখের দিন আসিবেরে কবে?
শোক তাপ সব ধুয়ে, মরণের সুখ
শীতল কোলেতে, ঘুমাব মাথাটি থুয়ে।

(নিরাশের আশা)

কবির প্রেয়সী তাঁর প্রথমা পত্নী। তিনি তাঁর ভালোবাসার সান্নিধ্য স্বপ্নেই খুঁজে ফেরেন। কিন্তু তা কখনোই পূর্ণতা লাভ করে না। ফলে অজানা এক অতৃপ্তি আর বিষাদ মনকে গ্রাস করতে থাকে। তাই ভালোবাসার কাঙাল কবি প্রেয়সীর জন্য শ্মশানকালীও হতে চেয়েছেন—

স্বপনে দেখিনু আমি পাই তার সাড়া,
ধীরে ধীরে সরে গেল নাহি দিল ধরা।
এবে সকলের বিরাম সুখের
আরাম ঘুমের ঘোর;

আমিই কেবল রয়েছি জাগিয়া
নিদারুণ দুখে থাকিয়া থাকিয়া
উঠিছে কাঁপিয়া পরাণ মোর।
করিলাম পণ তেয়াগি ভবন
শ্মশানবাসী হব।
সেই শতনাম পরাণে লিখিয়ে
বিবেকের রজ মাখিয়ে মাখিয়ে
সমাধির তলে পড়িয়ে রব।

(স্বপ্ন)

প্রেমিক কবি রামচন্দ্রের বিরহ-কাতরতার সঙ্গে নিজেকে যখন তুলনা করেন, তখন তাঁর মানসিক যন্ত্রণা এক শাশ্বত অনুভূতিতে মিশে যায়। এই অনুভূতিতেই স্নিগ্ধস্বরে তিনি কালিদাসের যক্ষ-প্রসঙ্গ চিত্রায়িত করেন,

শুনাইল কবি চূড়ামণি—
একাকি শিখরে থাকি
বিরহী বিনয়ে ডাকি
অচেতনে সচেতন গণি।
কহে জলধরে নিজ দূত রূপে বরি
যাও প্রিয়তম, মম বারতা আহরি।

(বিনোদন)

মর্মাহত কবি নিজের প্রেম-সাধনায় প্রত্যয় রেখেছেন। তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন যে একদিন প্রিয় পত্নীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটবে। এই মিলন ইহলোকে নয়, তা পরলোকেই সম্ভব—

সে সময়ে নাহি ছিল বাসনা আমার
স্বরগের তরে।
সে সময়ে ইহলোকে স্বরগ ছিল রে মোর
চাহি নাহি স্বরগ অপরে।
আছে মোর প্রেমতারা, প্রেম-যোগবল
প্রেমের সাধনা।
নরলোকে যেই প্রেম ইন্দ্রিয় মিলনে
ছিল কলুষিত।
বিমল স্বরগধামে পরশি ইন্দ্রিয়মালা
সে প্রেমে হবে না অপবিত।

(ইহলোকে পরলোক)

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বীরচন্দ্রের ‘অকাল কুসুম’ প্রকাশিত হল। বইটি মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য। আর তা মুদ্রিত হয়েছিল আগরতলায় স্থাপিত বীরযন্ত্রে। অন্যান্য সংকলনের মতো ‘বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মণ’ নয়, এ কাব্যের কবি ‘ললিতমোহন দেব বর্ম্মণ’— নামটি বীরচন্দ্রের পিতৃপ্রদত্ত ডাকনাম।

বীরচন্দ্র মাণিক্য এ কাব্যের আখ্যাপত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। চণ্ডীদাসের পদটি,

যে জন না জানে পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে পরকে মজায়
পিরীতি রাখিতে নারে।
(আখ্যাপত্র, 'অকাল কুসুম')

বীরচন্দ্রের দুটি সত্তা। একদিকে তাঁর ব্যক্তি ও রাজ-সত্তা, আর অপরদিকে কবি ও শিল্পী সত্তা। তাঁর কবিতায় এই দুই সত্তাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

'অকাল কুসুম' কাব্যটি বীরচন্দ্র উৎসর্গ করেছিলেন মনোমোহিনী দেবীকে। উৎসর্গপত্রে রয়েছে,

শ্রীশ্রী মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর কোমল করকমলে উপহার
পিরীতি কুসুম— সন ১২৯৬ ত্রিপুরা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ।'

গেঁথেছি তোমার লাগি বিজনে বসিয়া আমি
যে সাধের মালা,
উজল মানিক নহে— নহে যুঁই বেলি,
রূপে গন্ধে নাহি করে আলা।

এরপরেই তিনি বলেছেন,

কবিতা স্বরূপে হেরি এ কি গো তোমারি মুখ,
ভালমন্দ নাহি জানি, গাঁথিয়া পেয়েছি সুখ।
রূপে গুণে তোমারি মতন
তাই এত করেছি যতন।
(উৎসর্গপত্র, 'অকাল কুসুম)

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্ত্য একটি বিশেষ পর্যায়। প্রিয় পাশে থেকেও বিরোধজনিত যে বেদনা, তারই আস্বাদযোগ্য অবস্থা প্রেমবৈচিত্ত্য। পাশেই রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তবুও রাধিকার মনে বিরহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীধাধিকার মনে হয়েছে যেন তাঁর প্রিয়তম বহুদূর চলে গিয়েছেন। ফলে তাঁর অন্তর বেদনা-বিধুর হয়ে কেঁদে উঠেছে। কাছে থেকেও বিরহের এই আকুলতা প্রেমবৈচিত্ত্যের বিশিষ্টতা। বীরচন্দ্রও অনুভব করেছেন, পাশে প্রিয়া রয়েছেন, কিন্তু তবুও কেন যেন 'মরমে লাগিছে সদা বিরহ বেদনা'।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস'। ক্ষুদ্রায়তন কাব্যটির সম্পূর্ণ-অংশ পাওয়া যায়নি। ফলে এর প্রকৃত প্রকাশকাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। হয়তো এই কাব্যটি 'প্রেম মরীচিকা' এবং 'অকাল কুসুম'-এর অল্প পরবর্তীসময়ে রচিত।

যে কবি পত্নী-বিয়োগে কাতর, লিখেছেন 'প্রেম মরীচিকা'র মতো শোককাব্য— সে কবির অল্প পরবর্তীকালের কাব্যসংকলন 'উচ্ছ্বাস' শিরোনামে প্রকাশিত হল। প্রশ্ন জাগে, এ কীসের উচ্ছ্বাস ?

মুকুলকুমার ঘোষ, বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যকৃতির সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি 'উচ্ছ্বাস' কাব্যের আলোচনায় বলেছেন,

প্রথমা পত্নী ভানুমতী দেবীকে হারিয়ে কবি বীরচন্দ্রের মন যে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল,

> সে বিষয়টি 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যে ধরা পড়েছে। পরবর্তীসময়ে তরুণী পত্নী মনোমোহিনী দেবীর সান্নিধ্যই তাঁর সন্তপ্ত প্রাণে নতুন করে আশার সঞ্চার করে দিয়েছে।... এক্ষেত্রে যতটুকু উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে, তা যে মনোমোহিনী দেবীকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহর অবকাশ নেই।[৯]

এ সত্য যে মনোমোহিনী দেবীর সান্নিধ্য বীরচন্দ্রের প্রাণে ও মনে নতুন লহর তুলেছিল। মনোমোহিনী দেবীকে কেন্দ্র করে বীরচন্দ্রের উচ্ছ্বাস 'সোহাগ' কাব্যসংকলনে বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু 'উচ্ছ্বাস' কাব্যে মনোমোহিনী দেবীর সান্নিধ্য-প্রসঙ্গ নয়, বরং কবির মধ্যে এক বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ভাব বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গিয়েছেন। প্রিয়বিরহে রাধিকা মোহ্যমান— বৃন্দাবনে আর ফিরে আসবেন না শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তবুও রাধার কল্পনা ও ভাবরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়েছে। এককথায় রাধার বেদনা ও আকুতি পরিণতি লাভ করেছে ভাবসম্মিলনে।

শোকাকুল বীরচন্দ্রেরও রাধার মতোই উপলব্ধি হয়েছে—

> সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া
> দুঃখের হৃদয়ে আজি
> নেশার আধেক ঘোরে
> রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া।
> নয়নে ভাসিছে গত সুখের স্বপন,
> পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন।

প্রিয়বিরহে কাতর কবি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন শাশ্বত ভারতীয় দর্শনে, বৈষ্ণব তত্ত্বে। বৈষ্ণব সাহিত্য তত্ত্বে তিনি অবগাহন করেছেন, নিজের ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা পেয়েছেন ভাবোল্লাসে।

ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর পর কবি নতুন করে জীবনকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেলেন। 'হিয়া ভরা বেদনা' নয়, এবার প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ-উল্লাস। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বীরচন্দ্র নিজের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের পদ তুলে ধরেছেন,

> আজু রজনী হাম ভাগে-পোহায়লুঁ
> পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
> জীবন যৌবন সফল করি মানলু
> দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।
> (আখ্যাপত্র, 'উচ্ছ্বাস')

দুঃখ নয়, আনন্দ ধ্বনিরই প্রকাশ এই কবিতা। বীরচন্দ্রের মনে আর শোক নেই। তিনি বিরহের যন্ত্রণাকে জয় করেছেন। এখন তাঁর অনুভূতি ভাবোল্লাসের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এই উচ্ছ্বাসেই যেন বীরচন্দ্রের প্রেম-ভাবনা, ব্যক্তিগত আর্তি পরিপূর্তি লাভ করেছে।

'বীরচন্দ্র রচ দুঁহু রস গান'

বীরচন্দ্রের পঞ্চম কাব্য 'হোরি'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে। হোরি বা হোলি শব্দের অর্থ হচ্ছে বসন্তোৎসব। উনিশ শতকের শেষার্ধে বীরচন্দ্রের জীবনে হোরি উৎসবের কতটা গুরুত্ব ছিল, তা কর্নেল

ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার বর্ণনায় আমরা জানতে পারি,

> রাজপুতানায় যেমন ফাগ উৎসব— ত্রিপুরায় তেমনি হোরি। রাজা হইতে প্রজাবৃন্দ এ উৎসবে সকলে মাতোয়ারা; সাধ্য কি কাহারও যে সে-দিন পরিধেয় বস্ত্রের শুভ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেঙ্গ সে দিন যে লালে লাল, ফাগের দাগে ত্রিপুরার হৃদয় রক্ত-রাঙ্গা,— ভাবময়, সে দিন কে কাহাকে মান্য করে! কে ছোট কে বড়— আনন্দ— আনন্দ—, হোরি— ফাগুয়া!— হরষ-পরশে সব একাকার!![১১]

এটি হিন্দুস্থানী শব্দ 'হোলাকা'র অপভ্রংশ রূপ। বীরচন্দ্রের সমসাময়িক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের একটি কবিতাতেও আছে— 'হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী'। বীরচন্দ্র অবশ্য তাঁর পূর্বেই লিখেছেন হোরি-বিষয়ক চৌত্রিশটি কবিতা। লিখছেন,

> লালে লাল আজি কাল তনু,
> বৈর নারী শত, একলা কানু!
> পড়েছে ছিঁড়িয়া নব গুঞ্জ-ছড়া
> হেলিয়া পড়েছে মোহন চূড়া।

ত্রিপুরার রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে সেকালে বসন্তোৎসব বা হোলি উদ্‌যাপনের এক বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। 'রাজমালা'য় এ নিয়ে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে রামগঙ্গা শর্মার 'কৃষ্ণমালা'য় হোলি উৎসবের কথা বলা হয়েছে। কেমন ছিল এ উৎসব? এ উৎসবের বর্ণনায় কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখছেন,

> সে রঙ্গ কি একা সম্ভোগ করিবার! রাজপ্রাসাদে সে দিনের আহ্বান আনন্দের আহ্বান, কুটুম্ব মেয়ে-মহলে সে দিনের নেমন্ত্রণ আহারের জন্য নহে, আবির অবগাহন হেতু রাজদরবারে তলব পড়িয়াছে দরবারের জন্য নহে, ফাগুয়া উৎসবে মাতিতে। এ সময় কর নহে রজত মুদ্রা— প্রজাবৃন্দের ভক্তিমিশ্রিত অঞ্জলীকৃত সুবাসিত আবির; আর প্রতিদান তার "প্রসাদী রাঙ্গাধূলীকণা।" সকলেই উৎসবে উন্মত্ত; রাস্তাময় বালকবৃন্দ মর্কট আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে, গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আর ঐ রঙ্গের উৎস জলের পিকচারীর নল হাতে লইয়া। কাহারও সাধ্য নাই এই মর্কট শ্রেণীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগকে কোন উৎকোচই প্রলোভিত করিতে পারে না। বরং তাহাতে আরও তাহাদের উৎসাহ, অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। পঞ্চ দিবারাত্র এইভাবে উৎসব চলে, পঞ্চ দিবস উৎসব শেষ করিয়া পরে "বহ্ন্যুৎসব" উপভোগ সমাপণ অন্তে শান্তি লাভ করিয়া থাকে।[১২]

'হোরি' কাব্যটি ভক্তিগীতিকার অন্তর্ভুক্ত। এগুলি মূলত গান। বসন্তোৎসবে গীত এই গানগুলি পদাবলী সাহিত্যের অনুসরণে বীরচন্দ্র লিখেছেন। বীরচন্দ্র দাসের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে,

> ঐছে খেলত আজু সুরঙ্গ হোরি,
> ইথ মোহন উথ কোঙরী গৌরী।
> শ্যাম ছোড়ত যব রঙ্গ গোলারী
> ভৈ গোলাল কি ঘটা আঁধেরী।
> ...
> সখী খেলত রসরঙ্গ অতি ভোরি,

লিয়ে সখীয়ান নাচত প্যারী।
সব সখীয়ানা দেই করতালি।
হরষ পরশ সব নিরখত দৌ,
বীরচন্দ্র দাস মগন মন রৌ।

কাব্যের সূচনাতেই বীরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান সহগণ্‌-ললিতান্‌ শ্রীবিশাখান্বি তাংশ্চ' বলে ইষ্ট বন্দনা করেছেন।

রাধার অভিসার পর্বে তিনি রাধিকার অঙ্গরাগের বর্ণনায় উজ্জ্বল,

সমান ষোড়শী সমান রূপসী
নবীন মালা সঙ্গিনী সঙ্গে,
অঙ্গের আভরণ কাঁচলী বন্ধন
সমান সমান বেণী ঝুলিছে অঙ্গে।

এর পাশাপাশি মিলন পর্যায়ে বীরচন্দ্র বসন্ত-প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর কবি-কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,

আজু অপরূপ বৃন্দা বিপিনকি মাজে,
বিহরই ঋতুরাজ মনোহর সাজে।
নবীন পল্লবে কিবা সুশোভিত ডাল,
কত সারী, শুক, পিক গাওয়ে রসাল।
নানা জাতি ফুলদলে শোভিত কানন অন্তে,
মৃদু মৃদু বহতহি মারুত বসন্তে।

সবশেষে, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের ধ্যান করে কবি বীরচন্দ্র নিজেকে সকল ঐহিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চেয়েছেন। মহাজন পদকর্তাদের মতোই বীরচন্দ্র ভণিতায় অকুণ্ঠচিত্তে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে গেছেন। তিনি সবিনয়ে ভণিতায় লিখেছেন,

কিবা ইন্দ্রধনু আভা শোভে চূড়া মনোলোভা
দুলিতেছে মৃদুমন্দ বায়ে।
অধরে যুগল হাসি কত শশী পড়ুক খসি
কত কত কাম মরুছায়ে।।
হেরিয়া যুগল রূপ রাজ্যত্যাগী কত ভূপ
কি দিব সে রূপের উপমা।
বীরচন্দ্র মূঢ়মতি বর্ণিবারে কি শকতি
সে যুগল রূপের মহিমা।।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের আরেকটি গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীঝুলন'। এই গীতি-সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ঈশানচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে। 'উপহার' শীর্ষক কবিতা ছাড়াও গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে,

রাজবাড়ী— নুতন হাবেলী,
২৮শে বৈশাখ, ১৩০২ ত্রিপুরা।
প্রিয়তমা,

স্বর্গীয়া ভানুমতী দেবীর
কর-পঙ্কজে।

‘শ্রীশ্রীঝুলন’ পঞ্চাশটি গীতের সমাহার। অবশ্য এর মধ্যে আটটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বইটির সূচনায় বীরচন্দ্রমাণিক্য জানিয়েছেন,

> ‘ঝুলন-গীতি মহাজন-পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত। পদের ভাষা অপ্রচলিত ও দুরূহ, তাহাতে অধিকার জন্মান সুকঠিন; গানগুলি যে তত সুবিধার হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না, ইহা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি দায়ক বলিয়াই, যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহার কোনও অংশ সংশোধন না করিয়া প্রকাশ করিলাম।[১০]

গানগুলি বীরচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনা। তাই, তিনি নিজেই গানগুলি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। পরলোকগত পত্নী ভানুমতী দেবীকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছিলেন,

দেবি,
তুমিত স্বরগ-পুরে— জানিনাকো কত দূরে,
কোন্ অন্তরাল-দেশে করিতেছ বাস,
পশিতে কি পারে সেথা মানবের শোক গাথা,
বিরহের অশ্রুজল, দুখের নিশ্বাস;
হেথা আমি আছি প’ড়ে হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে
গণিতেছি সারা দিন জীবনের বেলা,
যেন রে উপল-দেশে সাথিহীন একা ব’সে,
জানি না ফুরাবে কবে মরতের খেলা;
(উপহার)

বীরচন্দ্র নিজ-রাজ্যে বৈষ্ণব উৎসবের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এতে রাজ-অন্তঃপুরের মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন। রানি ভানুমতীর ‘আদেশে’ বীরচন্দ্র ব্রজবুলি ও বাংলায় কিছু গান রচনা করেছিলেন। সেগুলিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ‘শ্রীশ্রীঝুলন’ শিরোনামে।

কৃষ্ণ বা রাধিকার রূপ বর্ণনার পাশাপাশি নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনাতেও বীরচন্দ্র ছিলেন সাবলীল। এই বর্ণনায় কোনও উগ্রতা বা উচ্ছ্বাস নেই— আছে শান্ত-সমাহিত প্রকৃতি-চিত্র,

বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,
ঘন আবরণে মলিনা ভাতি।
নব জলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুর ডাকয়ে হরষে।

বীরচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন,

গরজে বারিদ, চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এ হেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস

যুগলমিলন নিরখিতে আশ।
(মিলন, ২৫ নং পদ)

ঝুলনগীতিতে বীরচন্দ্র গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক বেশ কিছু গীত সংযোজন করেছেন। তারই একটি গানে গৌরচন্দ্রের দিব্যকান্তির বর্ণনায় বীরচন্দ্র প্রথমেই লিখেছেন,

দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ,
প্রভাত অরুণ জিনিয়া,
সুরঙ্গ হিন্দোল অতি ঝলমল,
ঝুলায় ভকত মিলিয়া,
সঘন আনন্দে করু জয়ধ্বনি,
যতেক নদীয়া বাসিয়া,
... ...
পহুঁ গুণগান আনন্দে গাওত,
দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া।
(শ্রী শ্রী গৌরচন্দ্র)

এ গ্রন্থ ছাড়াও তিনি রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক বেশ কিছু পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর সেগুলির কিছু প্রকাশিত হয়েছিল 'ফাল্গুনী' শীর্ষক একটি সংকলনে। আগরতলা থেকে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত উক্ত সংকলনটির প্রকাশক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা।

রাজা ও কবি

বীরচন্দ্রের কবিতা ও গান দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমটি কবির ব্যক্তিগত প্রেম-ভাবনা ও আর্তি। আর দ্বিতীয়টি মূলত উৎসব-সংগীত।

রাজ-অন্তঃপুরে ঝুলন ও দোল উপলক্ষে যে উৎসব হত— 'হোরি' ও 'শ্রীশ্রীঝুলন' সংকলন দুটিতে তারই আনন্দধ্বনি প্রকাশিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত আকুতি ও ভাবানুভূতি এ সংকলন দুটিতে প্রায় অনুপস্থিত। তবে তাঁর 'সোহাগ', 'অকাল কুসুম' ও 'উচ্ছ্বাস' কাব্যে কবির ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি, প্রেমবিরহগাথা প্রকাশ পেয়েছে। এ যেন বীরচন্দ্র মাণিক্যের জীবনকেই পরিপূর্ণ বৃত্তে আলোকিত করেছে, প্রকাশ করেছে ব্যক্তি বীরচন্দ্রের হৃদয়াকুতি।

বীরচন্দ্র গীতিকবিতার ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। কবিতার মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত আনন্দ-হর্ষ-উল্লাস ও বিষাদের ছবি এঁকেছেন। আর তাঁর এই ভাবনাবিশ্ব পরিচালিত হয়েছে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ভাবাদর্শে। বৈষ্ণব তত্ত্বে অবগাহন করেই তিনি নিজের ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন ভাবোল্লাসে। উল্লেখ্য, এই উপলব্ধির পর তিনি আর সেভাবে কবিতা রচনা করেননি। তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি প্রায়ই কার্সিয়াঙে কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে দুবার অতিথি হয়েছিলেন—

১৩০১ (১৮৯৪) ও ১৩০৩ (১৮৯৬) বঙ্গাব্দে। সেখানে গান-কবিতার পাশাপাশি বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনার নানা দিক তাঁরা আলোচনা করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অনত্যম সঙ্গী ছিলেন পণ্ডিত রাধারমণ ঘোষ।

দ্বিতীয়বার কার্সিয়াং ভ্রমণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> তিনি কার্সিয়াং-এ যা'বার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে। মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।[১৩]

'রাত প্রায় দশটা বাজিয়া যাইত', কিন্তু তবু তাঁরা কাব্য ও সংগীতচর্চায় মগ্ন থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪) থেকে বীরচন্দ্রকে প্রায়ই হয়তো শুনিয়েছেন,

মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে।

আবার পরক্ষণেই বীরচন্দ্রও হয়তো গেয়ে উঠেছেন,

আজু মন্দ মন্দ বহত পবন, বিরহিনীজন হৃদয় দহন
পিয়াকি কারণ ঝুরত নয়ন মাহেরী ফাগুন আয়েরী
ফুটা রহি ফুল মাধবী মালতী গেন্ধী গোলাপ উজার সেউতি
ওউর বকুল চম্পক যূথি অলিয়াগণ গুঞ্জরে
মত্ত ময়ূর নাচত সঘন হেরত বরজ যুবতীগণ
কোয়েলা কোয়েলী মধুকরগণ দাস বীরচন্দ্র গায়েরী।

এই যুগলবন্দি হয়তো দুজনকেই আকর্ষিত করেছিল। তাঁরা দুজনেই প্রভাবিত হয়েছেন বৈষ্ণব রস ও তত্ত্বে। এই আকর্ষণেই তাঁরা সংকল্প নিয়েছিলেন বৈষ্ণব পদসাহিত্য 'যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে' সংগ্রহ ও প্রকাশনের। কার্সিয়াঙে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৩০৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। পরের মাসে, অগ্রহায়ণে কলকাতায় ফিরে বীরচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে।

রাজা ও কবির যৌথ প্রয়াস আর বাস্তবায়িত হয়নি। এই অসম্পূর্ণতাই হয়তো রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি বাংলা সাহিত্যের।

তথ্যসূত্র

১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তারিখে।
২. গুয়াহাটির 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকদ্বয়' ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজের তৃতীয় ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছিলেন। একজন, দুর্গারাম ও অপরজন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯)। অসম থেকে তাঁরাই প্রথম উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন।
৩. 'আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই— সেইজন্য

সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।' মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে লেখা রবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণ-এর পত্র (২৩ বৈশাখ, ১২৯৩)। 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা, পুনর্মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৯৭

৪. কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা, 'দেশীয় রাজ্য', ১৯৪১, পৃ. ১৭৭

৫. Dipak Kumar Chaudhuri (edited), Administration Report of the Political Agency, Hill Tipperah, Volume II, Tripura State Tribal Cultural Research Institute and Museum, Agartala, March, 1996, p. 27

৬. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' (পঞ্চম খণ্ড), স্যানাল অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯১৩) পৃ. ৩৭৬

৭. নবদ্বীপচন্দ্র বর্মন (সংকলন ও সম্পাদনা: দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ও অরুণ দেববর্মা), 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি', ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, আগরতলা, ২০০৪, পৃ. ৪৪

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আগরতলায় কিশোর-সাহিত্য-সমাজে কবি-সম্রাটের বাণী', 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

৯. মুকুলকুমার ঘোষ, 'ত্রিপুরার রাজ-অন্দরে সাহিত্য চর্চা', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৭

১০. বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মণ, 'শ্রীশ্রীঝুলন', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ২০০৯

১১. কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১২. কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আগরতলায় কিশোর-সাহিত্য-সমাজে কবি-সম্রাটের বাণী', 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

লেখক পরিচিতি

তপোধীর ভট্টাচার্য	: আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। বর্তমানে এমেরিটাস ফেলো, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।
মিতা চক্রবর্তী	: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গুয়াহাটি।
শিপ্রা গুহ নিয়োগী	: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গুয়াহাটি।
মধুপী পুরকায়স্থ	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গুয়াহাটি।
দেবযানী দে	: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গুয়াহাটি।
অনামিকা চক্রবর্তী	: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর।
জাহ্নবী দাশ	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, লামডিং।
সোমা চক্রবর্তী	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি বি কলেজ, আসানসোল।
বরুণ কুমার সাহা	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি।
মৌমিতা পাল	: গবেষণা বিদ্যার্থী, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।
তপতী দত্ত	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আর.জি. বরুয়া কলেজ, গুয়াহাটি।
প্রসূন বর্মন	: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ, গুয়াহাটি।

অরুণ

বিভাগীয় পত্রিকা

বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ

নবপর্যায় ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥ ২০১৬

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' দেশভাগ ও প্রব্রজনের ভিন্ন আখ্যান	তপোধীর ভট্টাচার্য	৯
ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণ	মিতা চক্রবর্তী	২৩
'টপ্পা ঠুংরি'র বিষ্ণু দে	শিপ্রা গুহ নিয়োগী	৩৪
বঙ্গে নারীভাবনা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সমকাল	মধুপী পুরকায়স্থ	৩৮
রাভা সাহিত্য ও চাম্পাই	দেবযানী দে	৪৮
ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের দলিত সাহিত্য : কিছু কথা	অনামিকা চক্রবর্তী	৫২
অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা, নারীর Identity Crisis এবং বনফুলের ছোটগল্প : একটি অনুসন্ধান	জাহ্নবী দাশ	৬০
দাম্পত্য সমীকরণ : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দুটি উপন্যাস	সোমা চক্রবর্তী	৬৭
বনফুলের সাহিত্য ভুবনে কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	বরুণ কুমার সাহা	৭০
দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প: নির্বাচিত পাঠ	মৌমিতা পাল	৭৬
মেয়েদের রচিত বাংলা ছোটগল্পে মেয়েদের অস্তিত্বের সংকট	তপতী দত্ত	৮৪
বীরচন্দ্র দেববর্মা : ইতিহাসে উপেক্ষিত এক কবি	প্রসূন বর্মন	১০৫
লেখক পরিচিতি		১২০

সম্পাদক মধুপী পুরকায়স্থ

ISSN 2278-8026

বঙ্গ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ
বাংলা বিভাগ, কটন কলেজ